ছাড়পত্র

আশাপূর্ণা দেবী

মিত্র ও ঘোষ
১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

উৎসর্গ

শ্রীমতী রত্নমালা দেবীকে

আশাপূর্ণা দেবীর অন্যান্য গ্রন্থ :

অগ্নিপরীক্ষা
নির্জন পৃথিবী
বলয়গ্রাস
নেপথ্য-নায়িকা
গল্প-পঞ্চাশৎ
শ্রেষ্ঠ গল্প
স্বপ্নশর্বরী
কল্যাণী
অতিক্রান্ত
মিত্তির বাড়ী
সাগর শুকায়ে যায়
আংশিক
নবজন্ম
শশীবাবুর সংসার
যোগবিয়োগ

ছাড়পত্র

অনেক ঝঞ্ঝাট, অনেক গ্লানি, অনেক কদর্যতা, আর অনেক লজ্জাজনক পরিস্থিতির পর অবশেষে বন্ধনমোচন হল। আবার পুরনো পিতৃ-পদবীতে ফিরে এল সুচেতা। কুমারী-জীবনের পদবীতে, আজীবনের পদবীতে। নিজের নাম লিখতে আবার সে লিখতে পাবে সুচেতা বসু। স্কুলের বাংলা দিদিমণি যে নামটা নিয়ে কতদিন হাসতেন, তোমার নামের আগে পিছে 'সু', খেয়াল আছে তো? সারাজীবন তোমায় 'সু' মেয়ে হয়ে থাকতে হবে বুঝলে?"

সেই বাংলা দিদিমণি লতিকা রায়, তিনি কি এখনো বেঁচে আছেন? না থাকবার কারণ তো কিছুই নেই। ক' বছরেরই বা কথা? আর কতই বা তখন বয়েস ছিল তাঁর? হয়তো বেঁচে আছেন, হয়তো খবরের কাগজের খুঁটিনাটি খবরগুলো মন দিয়ে পড়বার অভ্যাস তাঁর আজও আছে। তাঁর 'সু' ছাত্রী সুচেতা বসু কী সুন্দর ভাবে তাঁর নির্দেশ মেনে চলছে, সেটা কি খেয়াল করছেন তিনি? না কি ভাবছেন, সুচেতা নামটা সচরাচরের নয়, তবু আরও রয়েছে দেখছি। আরো ভাবছেন, কী কুৎসিত নোংরা এই মেয়েটা! নামের কলঙ্ক যেন।

কিন্তু তিনি কি জানেন, কী দুঃসহ জীবনের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে সুচেতার এই নির্লজ্জ লড়াই।

সে জীবন যে ক্রমশঃ অক্টোপাসের কঠিন আলিঙ্গনের মত শ্বাসরোধকারী হয়ে উঠেছিল, পিষে মেরে ফেলতে চাইছিল সুচেতাকে। সেই মৃত্যু-আলিঙ্গনের বন্ধন থেকে আজ মুক্তি পেয়েছে সুচেতা। অনেক যন্ত্রণার শেষে।

আদালত থেকে যখন বেরিয়ে এল সুচেতা, তার মনে হল যেন একটা ক্লেদাক্ত পঙ্কিল গহ্বর থেকে বেরিয়ে এল। যতদিন ঝড় ছিল

উদ্দাম, ধুলোবালির দিকে নজর পড়ে নি, ঝড় থামতেই চোখে পড়ল এখানে সেখানে কী জঞ্জালের স্তূপ !

যেদিন যেদিন মামলার দিন পড়েছে, মেজদা আর উকিল জামাইবাবুর সঙ্গে গাড়ি করে চলে এসেছে আদালতে, লক্ষ্য উদ্ধার পাবার। লক্ষ্য পড়ে নি আশে পাশে আর কেউ আছে। আজ লক্ষ্য পড়ল। আর মনে হল বিশ্বশুদ্ধ চোখ শুধু তার দিকেই কৌতুক আর কৌতূহলের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

আইন তাকে অত্যাচারী স্বামীর হাত থেকে বাঁচাতে বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার দিয়েছে, কিন্তু লজ্জার হাত থেকে বাঁচাবে কে ? যুগযুগান্তর-সঞ্চিত সংস্কারের সেই লজ্জা, সেও কি অক্টোপাসের মত তার বহুভুজ দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে আঁকড়ে নেই এদেশের মনকে ? সুচেতার মনই কি দেশছাড়া ?

অহর্নিশি পীড়নে যে মন দুর্বার বিদ্রোহে মুক্তির পথ খুঁজেছে, আজ মুক্তি পেয়েও সে মন লোকচক্ষুকে সহ্য করতে পারছে না।

তাড়াতাড়ি তাই গাড়িতে গিয়ে উঠল সুচেতা মাথা নীচু করে।

গাড়ি চলতে শুরু করতেই সুচেতার জামাইবাবু মহোৎসাহে বলেন, "যাক্ এতদিনের যুদ্ধ সাঙ্গ। আজ রাতে নিশ্চিন্দি হয়ে ঘুমিয়ে বাঁচা যাবে। কি বল ছোট শালী ? কেমন আটঘাট বেঁধে মামলাটি সাজানো হয়েছিল তা বল ? ভেস্তে দেবার জন্যে কি কম চেষ্টা করল ছোঁড়া ? পারতে আর হল না। সত্যি ছোঁড়াটা একেবারে ওআর্থলেস। তুই পুরুষ ব্যাটাছেলে, স্ত্রী ডাইভোর্স-স্যুট এনেছে, এই লজ্জাতেই রেল-লাইনে মাথা পাতগে যা, তা নয় 'সময় দাও, ক্ষমা চাইছি, নিজেকে ভাল করব'—এই সব হাজারো বায়নাক্কা। ছ্যা ছ্যা ! ও যে বিলেত গিয়েছিল, ব্যারিস্টারী পাশ করে এসেছে, এসব কথা যেন বিশ্বাসই হয় না। মুখ একেবারে চুপ। শেষ রায় পড়ার সময় বাছাধনের মুখটি দেখেছিলি সু ? শুকিয়ে যাকে বলে আমসি ! শেষবারের মত একবার চাঁদমুখটি দেখে নিলে পারতিস।"

নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে ওঠেন জামাইবাবু।

সুচেতা অবশ্য নির্বাক।

সুচেতার মেজদা একবার নড়ে চড়ে বসে বলেন, "থাক না ওসব কথা। ঝঞ্ঝাট কাটল, এই ঢের।"

কিন্তু জামাইবাবু এখন চুপচাপ থাকতে রাজী নন। এতদিন কি হয় কি হয় অবস্থা ছিল, তাই নিজ মহিমা প্রচারে বিরত ছিলেন, কিন্তু এখন তাঁর দিন এসেছে। কত বুদ্ধি খাটিয়ে, কত হুঁশিয়ার হয়ে, কত সাবধানে তিনি সুচেতার বানচাল-জীবন-নৌকাখানাকে তীরে এনে ফেলেছেন, সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করবেন না? তাই মেজদার নিষেধবাণী গায়ে না মেখে বলে ওঠেন, "ঝঞ্ঝাট কাটল বলেই তো স্ফূর্তি!···সু, তোমার এবার উচিত আমাদের সকলকে তোয়াজ করে খাইয়ে দেওয়া। কি হে মেজ ব্রাদার, তুমিই বল উচিত কি না? ঘটা করে বিবাহবার্ষিকী পালন করাটা তো সেকেলে হয়ে গেছে, তুমি এবার সমাজে একটা মডার্ন ফাংশন প্রবর্তন কর, ঘটা করে বিবাহ-বিচ্ছেদ—"

থেমে যেতে হল জামাইবাবুকে। সুচেতার মেজদা বয়সে-বড় কিন্তু মান্যে ছোট ভগ্নিপতিটিকে প্রায় ধমকেই ওঠেন, "আঃ জগদীশ! তুমি একটু থামবে? অসম্ভব মাথা ধরেছে, অসহ্য লাগছে।

"ওঃ অসহ্য!" জামাইবাবু গম্ভীরভাবে বলেন, "তা অসহ্য হতে পারে। একে বড় লোকের মাথা, তায় গরীবের কথা।"

পকেট থেকে সিগার-কেস বার করেন ভদ্রলোক। মনে মনে ভাবেন, এতদিন আমার কথা মধুবর্ষণ করছিল, এখন অসহ্য! সেই যে বলে না, বিয়ে ফুরোলে ছাঁদনায় লাথি, এ তাই।

কথাটা কিন্তু জামাইবাবুর খুব মিথ্যেও নয়।

এতদিন জামাইবাবুর আর তাঁর ব্যারিস্টার-বন্ধু ঘটক সাহেবের বাক্যাবলী মেজদার কাছে বেদবাক্যই হচ্ছিল। তখন শোভনতা শালীনতা কোন বোধই ছিল না। কিন্তু সে যেন একটা নেশার ঘোরে। এখন নেশা ছুটেছে; এখন শোভনতা আর শালীনতাবোধ মাথা চাড়া দিচ্ছে।

একটু বিশ্রাম নিলেই সেরে যাবে। আমি তো একটু বিশ্রামের আশায়—”

অগত্যাই যেন রয়ে যান জগদীশ। এই তাঁর স্বভাব। পরিস্থিতি যাই হোক, জামাইগিরিটি কখনো ছাড়েন না তিনি, আবার সুবিধে সুযোগ, আদরযত্নটুকুও ছাড়েন না।

সুচেতা জামাইবাবুর ব্যাপারে কিঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত হয়ে ভাবতে থাকে, এবার তার পরিস্থিতিটা কি? এতদিন যুদ্ধ চলছিল, পিত্রালয়টা যেন হয়েছিল সে যুদ্ধের শিবির। এখন যুদ্ধ থামল, অথচ দুর্গ নেই। শিবিরের আশ্রয়ই ভরসা। কিন্তু শিবিরে কতদিন থাকা চলে? একবার গোত্রান্তরিত হয়ে যাওয়া মেয়ে আবার গোত্রে ফিরে এলে কী মনোভাব হয় সংসারের?

তবু বাড়ির পরিস্থিতিটা যে আজ এ রকম হবে, এ কথা কে ভেবেছিল? কে ভাবতে পারে? কল্পনাতীত অবস্থাকে কি কল্পনা করা যায়?

বাড়ি এসে শুনল, নাকি সৌরেশ এসেছিল। এসেছিল কয়েক মিনিটের জন্যে, আর মাত্র এক মিনিট আগে চলে গেছে।

লোকটা কি পাগল? না পাকা শয়তান?

এরকম সৃষ্টিছাড়া নির্লজ্জতা কি একটা সুস্থ মানুষের পক্ষে সম্ভব? কেন এসেছিল? কৈফিয়ৎ কি?

কিছু না। সে নাকি তার পরম শ্রদ্ধেয়া মেজবৌদিকে শেষ প্রণাম জানাতে এসেছিল। এরপরও কি বলা চলে জগতে ধৃষ্টতারও একটা সীমা থাকে? কিন্তু সময় পেল কি করে? এই তো আদালতে—

তা পেয়েছে, আসবার সময় ঘটক সাহেবের সঙ্গে জামাইবাবুর যে অনেক কথা হল। যাক্, সে কথা যাক। অফুরন্ত সময় পাক।

কিন্তু এল কি বলে লোকটা?

সুজাতা এই নতুন উত্তেজনায় সারা বাড়িতে ঝড় তুলে বেড়াচ্ছে। বড়বৌদি বহুকাল গত, বড়দা নির্লিপ্ত। তবু তাঁর কাছে গিয়েও

একবার হানা দিয়ে এসেছে সে। তাছাড়া সেজদা সেজবৌদি—যাঁরা এই ঝড়ের উত্তর সাধকের ভূমিকা নিয়েছেন।

সকলের মুখে এক কথা—'এত বেহায়া মানুষ হয়? এত শয়তানি মানুষের আকৃতিতে সম্ভব?'

"আপনি কি বললেন?"

জগদীশ জিজ্ঞেস করেন মেজবৌদিকে। মেজবৌদি শান্তভাবে বলেন, "কি আর বলব? প্রণাম করতে এল, চলে যেতে তো বলতে পারি না? বললাম, ভাল থাক।"

"ব্যস্ ব্যস্! একেবারে আশীর্বাদ পর্যন্ত?" জগদীশ ব্যঙ্গ হাসি হেসে ওঠেন, "অনুরোধ উপরোধ করে আর দু'দণ্ড বসিয়ে চা খেয়ে যেতে বললেও পারতেন। আপনার আদেশ ঠেলতে পারত না বোধ হয়।"

"বোধ হয় নয়, ঠাকুরজামাই, নিশ্চয়।" বলে ধীরে ধীরে চলে গেলেন মেজবৌদি, খুব সম্ভব এই মাননীয় নন্দাইয়ের চা-জলখাবারের ব্যবস্থা করতে।

যে ঝড় উঠেছিল সেটা সুচেতাদের দেখে আর একবার উদ্দাম হয়ে উঠেছিল। অনেক বাক্যজাল, আর অনেক ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি করে সে ঝড় অবশেষে যখন থামল, বাড়ির আহারের পালা চুকলো, তখন সুজাতাদের নিয়ে গাড়িখানা বেরিয়ে গেল।

সুচেতা একলা হল অনেক রাত্রে। সুচেতা মিত্তিরের খোলশ ছেড়ে 'সুচেতা বসু' হয়ে। সিঁথির সিঁদুরটা অনেক দিন আগেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল অবহেলায় ঔদাসীন্যে, হাতের লোহা ফেলে দিয়েছিল কবে কোনদিন যেন, পুরনো কুমারী-জীবনের চেহারা নিয়েই ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তবু ঘরের দরজাটা বন্ধ করে বড় আর্শিটার সামনে এসে দাঁড়াল সুচেতা।

কেন?

বোধকরি নতুন করে অনুভব করতে, ফের 'সুচেতা বসু' হয়ে কেমন দেখতে লাগছে তাকে।

হয়তো দেখল, হয়তো দেখল না, কি দেখল কে জানে, হঠাৎ চোখের চাইতে কানটা সচেতন হয়ে উঠল সুচেতার।

সেজবৌদির কণ্ঠস্বর বেজে উঠেছে রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেদ করে।

এ ঘরের ঠিক পাশের ঘরটাই সেজদা সেজবৌদির।

আর সেজবৌদির গলার স্বরটা যেমন মাজা তেমনি তীক্ষ্ণ।

"বলি নি আমি তোমায় তখনই? যখন তোমার আদরের বোন প্রেমে পড়ে সবাইয়ের নিষেধ অগ্রাহ্য করে ওই হতভাগাটাকে বিয়ে করবার জন্যে ক্ষেপেছিলেন? বলি নি এ বিয়ের ফল ভাল হবে না? লাভ-ম্যারেজের শেষ পরিণাম তো এছাড়া আর কিছু দেখলামও না আজ পর্যন্ত! প্রথমে ঢলাঢলি, তারপর চুলোচুলি, শেষ অবধি ছাড়াছাড়ি, এই হল লাভ-ম্যারেজের রেজাল্ট।"

সেজদার গলা ভারী আর মৃদু, স্পষ্ট শোনা যায় না, একটু পরে আবার সেজবৌদির গলাই ঝলসে ওঠে।

"এই বোন নিয়ে কত কেলেঙ্কারিই হল তোমাদের! একবার বিয়ের সময় কী মাথা হেঁট, কী গালে মুখে চুনকালি পড়া, কী না অশান্তি! আবার এখন এই কাণ্ড! ছি ছি! আমার তো আত্মীয়-স্বজনের কাছে মুখ দেখান দায় হয়েছে!"

আর্শির সামনে থেকে সরে বিছানায় গিয়ে বসল সুচেতা। না, ক্ষুব্ধ হয়ে নয়, মর্মাহত হয়েও নয়, বসল যেন বর্তমানের তীর থেকে আছড়ে অতীতের সমুদ্রে!

সে সমুদ্র অথই।

মানুষের স্মৃতির ভাণ্ডারে সব কথা জমা থাকে না, সেখানের ভাণ্ডারী এক অদ্ভুত খামখেয়ালি। সে যে কী রাখে, কী ফেলে, বোঝা দায়। হয়তো নিতান্ত মূল্যবান বস্তুটার দিকে ফিরেও তাকায় না সে, অথচ নিতান্ত তুচ্ছ বস্তুটাকে আঁকড়ে মরে। স্মৃতির ভাণ্ডার খাপছাড়া অসম্পূর্ণ। কিন্তু কালের খাতায় লেখা হয় সব ইতিহাস, সেখানে চোখ মেলে দেখ, কোন কিছুই হারায় নি।

সুচেতা আপন অসম্পূর্ণ ভাঁড়ারে হাতড়ে মরুক, কালের খাতায় ধরে রাখা সুচেতার জীবনের সেই অধ্যায়টা উল্টে দেখা যাক। কী পুলক আবেশমণ্ডিত সেই নাটকের প্রথম অঙ্ক ক'টি। যেন জগতের সমস্ত রং, সমস্ত সুর, সমস্ত শোভা নিংড়ে গড়া।

সেই নাটকের একেবারে প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে চোখ ফেললে দেখা যাবে, ঘরসাজানো নিয়ে মহোৎসাহে তর্ক করছে ওরা—সৌরেশ আর সুচেতা। যেন মতবিরোধটাই একটা আনন্দ, তর্ক করাই পরম সুখ। সৌরেশ যদি বলছে, "খাটটা ঘরের মাঝখানে পাতা হোক," তো সুচেতা সঙ্গে সঙ্গে ঝঙ্কার দিয়ে উঠছে, "বলিহারী যাই টেস্টকে! এইটুকু ঘরের মাঝখানে খাট! ককখনো না। খাট থাকবে একেবারে দেয়াল ঘেঁসে।"

সুচেতা খুব বাহারে একঝাড় কাগজের ফুল কিনেছে ফেরিওয়ালার কাছে, সেটা রাখবেই রাখবে ফুলদানীতে, তার বক্তব্য রোজ কি ফুল কেনা সম্ভব হবে? এতো বেশ। সৌরেশ ছি ছিক্কার করছে তাকে। "কাগজের ফুল! তার চাইতে শূন্য ফুলদানী রেখে দাও, অনেক গভীর শিল্পবোধের পরিচয় দেওয়া হবে। রোজ ফুল কেনা সম্ভব হবে না? কেন? রোজ আলু কেনা সম্ভব হবে, রোজ মাংস কেনা সম্ভব হবে, আর ওটা সম্ভব হবে না?"

সুচেতা যে বাড়ির মেয়ে, সেখানে রোজ ফুল কেনার প্রশ্নই ওঠে না, কিন্তু আলু কি মাংস প্রচুরই আসে, তাই সে বলে, "হয় না দেখি তো! তাই বলছি।"

সৌরেশ হঠাৎ দুহাতে সুচেতার রোগা-গড়নের হালকা দেহখানা তুলে ধরে টেবিলে বসিয়ে দিয়ে বলে ওঠে, "আমাদের সংসারে হবে সুচেতা! আমাদের সংসারে আগে ফুল তারপর আলু। আর নেহাৎ যদি কোনদিন পকেট একেবারে গড়েরমাঠ থাকে, তাহলে ফুলদানী

নামিয়ে ফেলে তোমাকে বসিয়ে রাখবো এখানে, ঘর আলো করার পক্ষে সেটাও কিছু কম হবে না।”

বিলেত থেকে ব্যারিস্টারী পাশ করে এসেছে সৌরেশ সত্যিই বটে, কিন্তু লক্ষ্মীর অঞ্চলস্পর্শ লাভ করে নি এখনো। এখনো পশারের মুখ দেখেনি। বাপের আমলের পুরনো বনেদী বাড়িখানা ভাগ হয়ে গিয়েছিল অনেক খণ্ডে, তার থেকে নিজের অংশটুকু বেচে দিয়ে পালিয়ে এসেছিল সৌরেশ জ্ঞাতিগোষ্ঠির অরণ্য থেকে। সেই বাড়ি বিক্রীর টাকাটা আপাততঃ হাতে আছে, আর মনে আছে উৎসাহের জোয়ার। তবু গোছালো মেয়ে সুচেতা মস্ত একটা ফ্ল্যাট নিতে দেয় নি তাকে। বিয়ের আগে যখন সব ঠিক, যখন হৃদয় কানায় কানায় পূর্ণ, তখন একদিন তু'জনে মিলে এসে এই ফ্ল্যাটটুকু পছন্দ করে ভাড়া নিয়ে রেখে গিয়েছিল।

মস্তবড় একটা বাড়ির অনেকগুলো খোপের মধ্যে ছোট্ট একটা খোপ। তুখানা ঘর একটুখানি বারান্দা। আর একটুকরো সুন্দর শৌখিন ছিমছাম স্নানের ঘর। ব্যস শুধু এই। এইটুকুই এক বিশাল রাজ্য—চকমিলানো তিনমহলা বনেদী বাড়ির ছেলে সৌরেশ, আর নতুন বড়লোকের আধুনিক তিনতলা বাড়ির মেয়ে সুচেতার কাছে।

সেই রাজ্যটুকু সাজিয়ে তোলবার জন্যে আসবাবপত্র, ছবি ফুলদানী বেডকভার পর্দা কতকিছুর চাহিদা। আর তাই নিয়েই শৌখিন ঝগড়া।

রেজিস্ট্রী করে বিয়ে। প্রথানুযায়ী যৌতুক দানসামগ্রী কিছুই তো পায় নি ওরা। শুধু সুচেতার সঞ্চয় ছিল প্রচুর শাড়ি গহনা, এই যা।

দোকানে গিয়ে হয়তো সুচেতা যে বেড্‌কভারখানা বারবার নিরীক্ষণ করতে থাকে, সেইখানাই ঠেলে রেখে সৌরেশ বলে, “এ চলবে না, এ অসহ্য! তাকানো যাচ্ছে না এর চড়া রঙের দিকে—”

আর হয়তো সৌরেশ জানলা দরজার জন্যে যে পর্দাগুলো বাছছে, সুচেতা সেগুলো উল্টে দিয়ে সরাসর দোকানীকেই ডেকে বলবে, “এ সরান, অন্য কিছু থাকে তো দেখান। নইলে—”

এ এক মজার খেলা!

শুধু ফুলদানীর সেই কাগজের ফুলটা বাদে শেষ পর্য্যন্ত প্রত্যেকটি বিষয়েই সুচেতার জিত আর সৌরেশের হার হয়েছে।

আজও তাই।

গভীর একটা নিশ্বাস পড়লো সুচেতার বুক থেকে। জিত হয়েছে, কিন্তু মনের মধ্যে যেন পরাজয়ের গ্লানি। এমনটা হচ্ছে কেন? অথচ তখন কত খুঁটিনাটি ব্যাপারেও জিতে ফেলে কী না বিজয়-গৌরবের হাসি হেসেছে সুচেতা, কী না আনন্দে গর্বে ছলছল করেছে!

সেই যখন মাঝে মাঝে তারা 'শুধু দু'জনে' পিকনিক করবে বলে আগে থেকে সময় কি জায়গা কোন কিছু ঠিক না করে একটা ছুটির সকালে টিফিন ক্যারিয়ারে খাবার, বাস্কেটে ফল, ফ্লাস্কে চা, আর হাতে কবিতার বই নিয়ে হাওড়া কি শিয়ালদা স্টেশনে গিয়ে হাজির হতো!

সুচেতা যেন অফুরন্ত অতীতের মধ্যে হারিয়ে যায়। যেন হাওড়া স্টেশনেই ঘুরে বেড়ায় পাশাপাশি দুজনে হাতে কাঁধে জিনিস ঝুলিয়ে।

যে ট্রেনটা প্রথম পাবে, সেইটাতেই চড়ে বসবে, তা সে যে লাইনেরই হোক এই ছিল ওদের নিয়ম।

এনকোয়ারি অফিসের লোকগুলো কি ভাবতো ওদের? কে জানে। সে কথা কোনদিন গ্রাহ্যই করে নি।

"সবচেয়ে আগে কোন ট্রেনটা ছাড়বে?"

সৌরেশের আগ্রহব্যাকুল প্রশ্নের উত্তরে লোকটা চোখ কুঁচকে বলেছে, "কোথায় যেতে চান আপনি?"

"কোথাও না! শুধু কোন গাড়িটা আগে স্টার্ট করছে সেটা জানতে চাই।"

"কোন লাইনের সেটা বলুন?"

"যে কোন লাইন হ'লেই হলো।"

লোকটা হতাশ হয়ে হয়তো বলতো, "আপনার কথা বুঝতে পাচ্ছি না মশাই! দেখুনগে যান বোধ হয় এখুনি বর্দ্ধমান লোকাল ছাড়ছে।"

তা বিরক্ত হয়ে বলতো, "এইভাবে বাজে প্রশ্ন করে আমাদের সময় নষ্ট করতে আসার উদ্দেশ্য কি বলুন তো মশাই ?"

তাতে কি !

পৃথিবীর সমস্ত লোক বিরক্ত হোক না, ওরা তো দু'জনে পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত ! ওর বেশী আর চাইবার কি আছে ? রাতের আগে ফিরে আসা যায় এমন একটা দূরত্বের অঙ্ক কষে কেটে ফেলা হতো দু'খানা টিকিট !

হোক ই. আই. আর, কি বি. এন. আর, ই. বি. আর, কি—

আনন্দে ছলছল করতে করতে ছুটতে ছুটতে ট্রেনে চড়াই সুখ। হয়তো যতদূরের টিকিট কেনা হয়েছে, তার আগেই নেমে পড়া হতো। আর সেই নেমে পড়ার সমস্ত গৌরব সুচেতার।

সৌরেশ বলতো, "সে কী ! রেল কোম্পানীকে বাড়তি লাভ করিয়ে দিতে যাবো কেন ? সবটা উশুল করি ?"

সুচেতা নিজের ভাগের ব্যাগ কৌটো ঝোলা সামলে কাঁধে তুলতে তুলতে স্রেফ দাঁড়িয়ে উঠে মুচকে হেসে বলতো, "ঠিক আছে—তুমি উশুল কর ! আমার এইখানটাতেই নামতে ভীষণ ইচ্ছে করছে।"

"এখানটা বা কি এমন আহা মরি ?"

"তুমি বুঝবে না ! দেখ দিকি কী সুন্দর একটা সরু পায়ে-চলা পথ চলে গেছে গ্রামের দিকে ! আর কেমন বেচারী বেচারী স্টেশনটা ! ওমা ! ওমা ! কী মজা ! স্টেশনের নাম লেখা কাঠখানা খুলে ঝুলে পড়েছে, নামটা মোটে পড়াই যাচ্ছে না। ফাইন ! ফাইন ! এইখানেই নামবো আমি।"

ব্যস ঝট্ করে দরজা খুলে নেমে পড়তো সুচেতা।

হয়তো এক মিনিট স্টপেজ। হয়তো তাও নয়, তারও কম।

"আরে আরে করছ কি ?" বলে লাফ মেরে নেমে পড়তে হতো সৌরেশকেও, নড়ে ওঠা গাড়ি থেকে।

সুচেতা দেখেও দেখে না, যেন বুঝতেই পারছে না পিছু পিছু আর কোন ব্যক্তি আসছে কিনা। স্টেশন থেকে বেরিয়ে সেই পায়ে-চলা সরু পথটা ধরে এমন চটপট এগোতে থাকে যেন এটা ওর বহু পরিচিত পথ।

একটু জনবিরলতায় এসে পড়েই সৌরেশ পিছন থেকে ওর কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দেয়, "কী হচ্ছে এটা ? এমন ভাবে যাচ্ছ যেন রাস্তার শেষেই তোমার মাসীর বাড়ি ! আর তিনি তোমার জন্যে আশা পথ চেয়ে বসে আছেন !"

সুচেতা পিছনে ঘাড় হেলিয়ে একটু বিজয় দর্পের হাসি হেসে বলে, "তুমি এলে যে ? রেল কোম্পানীর ভাড়া উশুল করলে না ?"

সৌরেশ পাশাপাশি চলতে চলতে নকল গাম্ভীর্যে বলে, "ঠিকই করতাম সেটা, যদি খাবারদাবারগুলো সমস্ত নিয়ে পালিয়ে না আসতে। উপবাস দিতে পারি না তো ?"

"ওঃ শুধু এই জন্যে ?" সুচেতা মুখ টিপে হেসে বলতো, "মশাইয়ের হাতে কি কি দেখি দেখি ? ওঃ মাত্র টিফিন বাক্সটা, ফলের বাক্সটা আর চায়ের ফ্লাস্কটা ! আর সমস্তই আমার কাছে। সত্যি, কি করেই বা সারাটা দিন কাটাতে !"

সৌরেশ দমে না। মাথা নেড়ে বলে, "সে তো নিশ্চয় ! আসল জিনিসই যে তোমার কণ্ট্রোলে। তৃষ্ণার জল আর কবিতার বই ! ছুটো বিহনেই—মরুভূমি।"

"বাজে কথা বোলো না—" সুচেতা ধমকে ওঠে যেন, "মরুভূমির রহস্য আলাদা ! এক ড্রাম জল আর এক আলমারী কবিতা পুস্তক রেখে এলেই কি—"

"জানো তো সবই—" সৌরেশ এদিক ওদিক তাকিয়ে চট করে মুখটা একেবারে নামিয়ে আনতো, তারপর হেসে উঠে বলতো, "গাড়ির লোকে কি ভাবে কে জানে।"

"কত কি ! অনেক গল্প, অনেক উপন্যাস ! সেই তো মজা !"

.তারপর অর্থহীন খেইহীন কথার সমুদ্র! কথা বলতে বলতে কোন একটা গাছ তলায় বসে পড়তো দুজনে, কথাই বলে চলতো। কবিতার বইয়ের পাতা খোলা হতো দৈবাৎ। তবু আনা চাই। সঙ্গে না থাকলে যেন মনটা খালি খালি ঠেকে।

খাওয়াদাওয়া হতো এক সময়, সবদিনই খাবার বেড়ে যেতো অনেক। গ্রামের কোন চাষাভূষো ছেলেদের ডেকে ডেকে সে সব বিলিয়ে দিতেও কম মজা নয়।

একদিন কিন্তু বিপদ বেধেছিল একটা।

হাওড়া স্টেশনে ঘুরতে ঘুরতে ওদের 'যে কোন' গাড়িতে ঝাঁপ দেবার জল্পনা কল্পনাটা কেমন করে যেন রেল পুলিশের কোন কর্মচারীর কানে গিয়ে থাকবে, সঙ্গে সঙ্গে সন্দেহ।

অবশ্য সন্দেহ না করাই আশ্চর্য! পরে বলেছিল সৌরেশ, "যা কাণ্ড করি আমরা!"

তা সেদিন এরাও যে গাড়িতে চড়ে বসেছে, পুলিশ কর্মচারীটিও ঝাঁপিয়ে উঠে পড়েছেন তা'তে। ঠিক মনে নেই, বোধ হয় গোমো প্যাসেঞ্জার সেটা, বেলা দশটা আন্দাজ হবে।

প্রথমে অতটা খেয়াল করে নি সৌরেশ আর সুচেতা। নিজেদের বাহাদুরীর আনন্দেই বিভোর।

"কোথাকার টিকিট কিনলে?"

"কি জানি। ভালকরে দেখি নি।"

"কই দেখি টিকিটটা।"

"থাক্ না। দেখে কি হবে? যে কোন একটা অখ্যাত অবজ্ঞাত গ্রামে নেমে পড়া নিয়ে কথা!"

এরপর আর বোধ করি—পুলিশ ভদ্রলোক চাঞ্চল্য চেপে রাখতে পারেন নি, কাছে এগিয়ে এসে গম্ভীর ভাবে প্রশ্ন করেছিলেন, "আপনারা যাচ্ছেন কোথায়?"

"যাচ্ছি কোথায়! তাই তো!" সৌরেশের মুখ চোখ দিয়ে চাপা হাসি ঝলসে উঠেছিল, তবু সে যেন অসহায়ের ভঙ্গীতে সুচেতার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, "কোথায় আমরা যাচ্ছি বল তো?"

ওই গায়ে-পড়া লোকটা যে পুলিশ হওয়া সম্ভব এ কথা মনে আসে নি সুচেতার. তাই সে ওর 'গায়েপড়ামী'র দাওয়াই দিতে বলে উঠেছিল, "বাঃ আমি কি করে জানবো? আমায় কিছু বলেছো? কি তোমার মনে আছে তুমিই জানো।"

অতি উৎসাহে ভদ্রলোক একেবারে সৌরেশের কাঁধ চেপে ধরেছিলেন, "আমি আপনাদের অ্যারেস্ট করছি।"

"অ্যারেস্ট! বলেন কি? আপনি কি পুলিশের লোক মশাই?"

"কোথাকার লোক পরে টের পাবেন।"

নিজের ভারী দেহখানা ট্রেনের দরজার কাছে আড়াল করে দাঁড়িয়ে ভদ্রলোক বলেন, "আমাদের চোখে ধুলো দেওয়া সোজা নয়। মনে করেছেন দিব্যি রোমান্স করে মেয়েছেলে নিয়ে ভেগে পড়বেন, পুলিশ জানতে পারবে না কেমন?"

"অসভ্যতা করবেন না—"ঝেঁজে উঠেছিল সুচেতা, "আমরা স্বামী স্ত্রী!"

ভদ্রলোক কুশ্রী একটা হাসি হেসে মুখে একটা তাচ্ছিল্যের ধ্বনি করে বলেছিলেন, "স্বামী স্ত্রী! হুঁঃ! এমন কত স্বামী স্ত্রীই দেখলাম জীবনে! আবার সত্যিকার স্বামী স্ত্রী চোরাই কোকেন চালানের ব্যবসা করছে তাও দেখেছি, দেখতে আর কিছু বাকি নেই ম্যাডাম। এখন সত্যিকার স্বামী স্ত্রীর সত্যিকার পরিচয় থানায় দেবেন চলুন!"

গাড়ির বাকী আরোহীরা একটা মজাদার দৃশ্যের আশায় হাঁ করে খাড়া হয়ে বসেছিল।

সুচেতার মুখটা শুকিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সৌরেশ দমে নি। অবহেলার ভঙ্গীতে ওর অদ্ভুত সুন্দর চুলগুলোর মধ্যে আঙুল চালাতে চালাতে বলেছিল, "আপনার অ্যারেস্ট করবার রাইটটা দেখি!"

"হ্যাঁ হ্যাঁ দেখি দেখি," আরোহীদের মধ্যে অস্ফুট একটা গুঞ্জন উঠেছিল, "সাজা পুলিশের ব্যাপারও ঢের দেখা যায়, ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করে।"

পুলিশ কর্মচারীটি মুখে যতই বলুন, বোধ করি জীবনে এ ধরণের কেস পাবার সৌভাগ্য তাঁর হয় নি, তাই তাড়াতাড়ি রেল কোম্পানির নামাঙ্কিত পুলিশ প্রমাণ দাখিল করেন।

"ঠিক আছে!" সঙ্গে সঙ্গে সৌরেশও বার করেছে কার্ডকেস। সৌখিন সুমুদ্রিত দামী কার্ড, পরিচয় বহন করছে 'এস. এন. মিত্র. বার-এ্যাট-ল।'।

"আমার পরিচয় পত্রও রাখুন একখানা।" বাকী যা দরকার আদালতেই পাবেন।"

এক নজর চোখ বুলিয়েই মুখটা একটু শুকিয়ে গিয়েছিল ভদ্র-লোকের। তারপর চোখ বুলিয়ে নিয়েছিলেন সৌরেশের আপাদ মস্তক। মহিলাটির অঙ্গে দামী শাড়ি গহনা আছে বটে কিন্তু এই লংক্লথের পায়জামা আর আদ্দির পাঞ্জাবী পরা চুল ওল্টানো রূপের কান্তি ছোকরাটা না কি একজন বিলেত ফেরত ব্যারিস্টার!

নির্ঘাৎ ভাঁওতা!

"ওসব ভাঁওতা ঢের দেখা আছে মশাই! গোটাকতক টাকা খরচা করে অমন কার্ড অনেক ছাপান যায়। বোঝা যাচ্ছে আপনি একটি পাকা ঘুঘু!"

"আর আপনি হচ্ছেন একটি বন্যবরাহ!" সৌরেশ হেসে উঠেছিল, "এস সুচেতা, ইনি কোথায় নামতে বলেন নেমে এঁর সাধটা মিটিয়ে দিই! কই মশাই দু'জোড়া 'হ্যাণ্ডকাফ্' আছে তো সঙ্গে?"

লোকটা একটু ভ্যাকাচ্যাকা খেয়েছিল। সৌরেশের বেপরোয়া ভঙ্গী দেখেই খেয়েছিল।

গাড়ির অপর আরোহীরা এবার সাহস করে এগিয়ে আসে, "মিথ্যে হ্যারাসমেণ্ট তো? এই আজকাল হয়েছে মশাই! আসল কাজের

সময় কর্তাদের টিকি দেখতে পাওয়া যায় না, আর নিরীহ যাত্রীদের—দেখুন না সেকেণ্ড ক্লাশ কামরায় দোহাত্তা বিনা টিকিটের যাত্রী উঠছে, লো ক্লাশের লোক সব, বেশীর ভাগই বাজারের ফড়ে কি চোরাই মালের কারবারী। অথচ বুকের পাটা কত! টিকিটের যাত্রীদের ঘাড়ে এসে পড়বে। তখন কেউ দেখতে পান না। আপনি—মানে আপনারা যাচ্ছেন কোথায়?"

"কিছু না মশাই, ছুটির দুপুরে একটু রোমান্স করতে বেরিয়েছি। সারাদিনের রসদ গুছিয়ে নিয়ে যেদিকে দু চোখ যায় বেরিয়ে পড়া, এই আর কি! তা আমাদের হতভাগা দেশে বিবাহিত স্বামী স্ত্রীর মধ্যে রোমান্স, একেবারে অভাবনীয় অসম্ভব অবিশ্বাস্য তো? তাই ইনি ভাবছেন টপ্ করে ধরে নিয়ে গিয়ে দিব্যি একখানা নারী হরণের মামলা সাজিয়ে ফেলবেন। তবে সে কেস আমাদেরই কারো হাতে চলে আসবে এই যা।"

"আপনি"—আর একখানা কার্ড এগিয়ে ধরেছিল সৌরেশ ওদের সামনে।

শেষ পর্যন্ত লোকটাই নাজেহাল হয়ে ক্ষমা চেয়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল। আর কামরার লোকেরা 'সাবাস' দিয়েছিল সৌরেশকে।

তারপর সুচেতা বলেছিল, "থাক আজ আর এ্যাড্ভেঞ্চার করে কাজ নেই। বাড়ি ফিরি।"

"ক্ষেপেছ! আজই তো বেশী আমোদ," গলার স্বর নামিয়ে বলেছিল সৌরেশ, "আজ তোমার গান শুনবো।"

গান!

সুচেতা এক সময় গান গাইতো বুঝি!

কতকাল আর গান গায় নি সুচেতা। মনে হচ্ছে কত যুগ! কত যুগান্ত! কই এতদিনের মধ্যে এখানে তো কেউ কোনদিন বলেও নি,

'সুচেতা একটা গান গাও শুনি !' আগেও বলতো না। গান শিখেছিল সুচেতা নিতান্তই নিজের জেদে। নিজেই গেয়ে সুখ।

না কারো দায় পড়ে নি সুচেতার গান শোনবার। এখন তো সুচেতার সমস্ত গান স্তব্ধ হয়ে গেছে !

কাটা কাটা টুকরো টুকরো ছবি মনের মধ্যে ঝলসে উঠছে।

সে-ই একদিন ওদের ছোট্ট সংসারে নিমন্ত্রণ করেছিল দিদি আর জামাইবাবুকে। প্রতিপদে দিদির সে কী নাক তোলা ! অথচ সুচেতাদের তা'তে রাগ নেই অপমান নেই। যেন এও এক কৌতুক ! যেন দিদি যে ওদের অবজ্ঞা করছে, সেটা দিদিরই বোকামী।

সুজাতা যখন বলেছে, "কি করে তুই এই খাঁচাটুকুর মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা কাটাস সু ? প্রাণ হাঁপায় না ? আমার তো এই দু ঘণ্টাতেই দম আটকে আসছে।"

তখন চোখে চোখে বিদ্যুৎ খেলে গেছে সুচেতা আর সৌরেশের মধ্যে। আর তারপর পরম বেচারী বেচারী মুখে সুচেতা বলেছে, "দম তো আমারও আটকায় দিদি ! কিন্তু কি করবো বলো ? ব্রীফলেস ব্যারিস্টারের মত ওঁচা জীব জগতে আর কি আছে ? সেই তার ঘর করতে হচ্ছে আমাকে। বলবার কিছু নেই, স্বখাত সলিল !"

জগদীশ পিঠ চাপড়ানো সুরে হাঁ হাঁ করে উঠেছেন, "আহা আহা, ও সব কি আলোচনা হচ্ছে তোমাদের ! বেচারা সৌরেশ রয়েছে এখানে। মেয়েদের এই এক দোষ, দু'জন একত্র হয়েছে কি পতিনিন্দা !"

দিদি কিন্তু মুখ কালো করে চুপ করে গেছেন। তারপর আবার তাসের ম্যাজিক দেখিয়ে আবহাওয়া হালকা করেছে সৌরেশ।

আলো-ঝলসানো নানা রঙের সেই দিনগুলি! কিন্তু কটাই বা দিন ?

তারপর সহসা একদিন দেখা দিল প্রলয়, প্রচণ্ড ভূমিকম্পে নড়ে উঠল পায়ের তলার মাটি। মহৎ শিল্পীর আঁকা একখানা ছবির গায়ে কে যেন কালির পোঁচড়া টেনে দিল।

রায় বেরোবার পরই আদালত থেকে বেরিয়ে এল সৌরেশ।

ঠিক যে কোন অবস্থায় এল বলা শক্ত! রাগ? দুঃখ? ক্ষোভ? হতাশা? অপমানের জ্বালা? কোনটা তীব্রতর হয়ে উঠেছে?

কে জানে! হয়তো কোনটাই নয়।

ভাবশূন্য নির্লিপ্ত একটা ভাবে যেন ছায়ামূর্তির মত বেরিয়ে এল। অনেকবার ভাবতে চেষ্টা করল 'সব শেষ, সব শেষ!' কিছুতেই ভাবতে পারল না।

তারপর কেমন করে যে, আর কেন যে সুচেতাদের বাড়িতে এল সৌরেশ নিজেও জানে না।

চাকর-বাকররা হাঁ করে তাকিয়ে দেখলো, মেজবাবু এলে একটা কিছু কাণ্ড হবে আশঙ্কা করলো, তবু বারণ করতে সাহস করলো না! কোন দিকে না তাকিয়ে দোতলায় উঠে গেল সৌরেশ। সামনেই মেজবৌদি।

মেজবৌদি চমকে উঠে থমকে দাঁড়ালেন। ভূত দেখলেন যেন!

সেই কথাটাই বললো সৌরেশ। ফিকে একটু হেসে বলল—"কী মনে হচ্ছে? ভূত দেখছেন?"

মেজবৌদি নিজেকে সামলে নিয়ে গম্ভীর হাস্যে বলেন, "প্রায় তাই!"

"কী যে খেয়াল হলো, হঠাৎ চলে এলাম। কাজটা খুব ঠিক করলাম না বোধ হয়, তাই না?"

মেজবৌদি আরো গম্ভীর হাস্যে বলেন, "এটা তো বোঝার উপর শাকের আঁটি।"

"তা বটে!" সৌরেশ মুখ তুলে একটু বিষণ্ণ হাসি হেসে বলে, "কিন্তু কি জানেন বৌদি, তখন কিছুতেই ভাবতে পারি নি খুব একটা ভুল করেছি। বরং অবিরত ভেবেছি ওর একটা ভুলভাঙ্গা দরকার। তুচ্ছ একটা ব্যাপারকে 'মস্ত' একটা কিছু ভেবে ও কেন অবিরত যন্ত্রণা পাবে! সে যন্ত্রণা থেকে ওকে মুক্ত করবার জন্যেই—"

মেজবৌদি বলেন, "অনেকটা যেন ভূত দেখিয়ে দেখিয়ে ভূতের ভয় ছাড়ানোর মত কি বল? কিন্তু তোমার পদ্ধতিটাকে প্রশংসা করতে পারছি না।"

"প্রশংসাযোগ্য নয় সেটা টের পেলাম পরে। কিন্তু আশ্চর্য, এখনো এত কাণ্ডের পরও কি মনে হচ্ছে জানেন বৌদি, ভুলটা ওরই। আর সে কথা ও হয়তো হঠাৎ কোন একদিন বুঝতে পারবে।"

মেজবৌদি স্থিরভাবে বলেন, "সব কথা সবাই বুঝতে পারে না সৌরেশ! তুমিও হয়তো এতদিন ধরে ক্ষুদ্রকে বিরাট ভেবে এসেছো। যে যা নয়, যার যা হবার সাধ্য নেই, তার ওপর সে মূল্য আরোপ করতে চাইলেই এমনি বিপর্যয় ঘটে।"

"হয়তো আপনার কথাই ঠিক, কিন্তু এখনো ঠিক মেনে নিতে পারছি না—"সৌরেশ ঈষৎ ঝুঁকে পড়ে মৃদু হেসে বলে, "যাক আপনাকে একটা প্রণাম করে যাই। এরপর আর বেশীক্ষণ থাকলেই ধনঞ্জয়ের ব্যবস্থা হতে পারে। আমার পুজনীয় উকিল ভায়রাভাই আসছেন পিছনে। অনধিকার প্রবেশের দায়ে আর একবার—"

কথার মাঝখানে মেজবৌদি বলে ওঠেন, "চিরদিন ধারণা ছিল সৌরেশ, উকিলের চাইতে ব্যারিস্টার জোরালো। ধারণাটা ভাঙলো। নিজে ব্যারিস্টার হ'য়ে আর একদল ব্যারিস্টার বন্ধু নিয়ে নিজের একটা মামলায় জিততে পারলে না?"

সৌরেশ হঠাৎ গলা খুলে হেসে ওঠে, "মামলাটা যে দেওয়ানীও নয়, ফৌজদারীও নয়। যে আমার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে চাইছে, তাকে আইনের ফন্দীতে আটকে রাখতে যদি পারাও যায়, রেখে লাভ কি?"

মেজবৌদি কিছু বলবার আগেই হঠাৎ ওদিকের বারান্দার সামনের ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন সেজবৌদি। এসে তিনিও চমকে গিয়ে থমকে দাঁড়ান। বোধ করি পরিচিত হাসির শব্দেই মুখ বাড়িয়েছিলেন, বিশ্বাস করেও বিশ্বাস করতে পারেন নি, একেবারে কাছে এসে সমস্যা ভঞ্জনের পথ ধরলেন।

"মেজদি !" সেজবৌয়ের কণ্ঠ থেকে যেন একটি আর্তস্বর উচ্চারিত হ'ল। তারপর মেজদিও অপরাধী আসামী উভয়ের মধ্যে দিব্য একটা অবিরোধী ভাব দেখে সামলে গেলেন সেজবৌদি। এবং অতঃপর একবার সৌরেশের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে অস্ফুটে, "আশ্চর্য" এই শব্দটি উচ্চারণ করে পিছন ফিরে চলে গেলেন।

"পালাও !" মেজবৌদি বলেন, "ভাগ্যি যাই কলিযুগে নয়নাগ্নিতে ভস্মিভূত হওয়ার রেওয়াজ নেই, তাই এ যাত্রা বেঁচে গেলে। আর দুঃসাহসে কাজ নেই।"

ভয় তাঁরও হচ্ছিল।

ভাইবোন আর তাদের ভগ্নিপতি এসে আবির্ভূত হলে কী না কী একটা নাটক ঘটে কে জানে !

"আচ্ছা" ! সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল সৌরেশ, আর যতক্ষণ তার জামার অংশটুকুও দেখা গেল, চুপচাপ তাকিয়ে থাকলেন মেজবৌদি।

মেয়েদের মন হতভাগা, ছন্নছাড়া, বাউণ্ডুলে, অবোধ অজ্ঞানদের প্রতিই বিশেষ মমতাশীল হয়, মনস্তত্ত্বে এ রকম একটা তত্ত্ব আছে না ? হয়তো সেটা সত্যিই।

পুরনো চাকরটাকে মামলা শুরু হতেই ভাগিয়ে ছিল সৌরেশ। অকারণেই বিশেষ সহৃদয়তা জানিয়ে বলেছিল, "তিনমাসের মাইনে আগাম নিয়ে বাড়ি যা। অনেকদিন যাস নি।"

চাকরটা অনেক আপত্তির পর চলে গিয়েছিল শেষ পর্যন্ত সাত পাঁচ ভেবে। সে তো দেখেছে সুখের বাসা ভেঙে যাওয়ার দৃশ্য। দেখেছে দিনের পর দিন অশান্তি। হয়তো মনে মনে বুঝলো, যে বাসা ভাঙছে, তাতে আর আশ্রিত বহিরাগতর আশ্রয়ের আশা কোথায় ?

এখনকার চাকরটা নতুন।

সে জানে বাবু একা মানুষ, কেউ কোথাও নেই ওর। এও জানে, বাবুর জামা জুতোর পাহাড় থেকে মাঝে মাঝে দু-চারটে চাওড় খসালেও টের পাবে না বাবু। আর নিয়মিত পকেট হালকা করে চললেও বুঝতে পারবে না। অতএব সুখেই আছে সে। তবে সৌরেশ বাড়ি এলেই তার সেবা যত্নের ব্যাপারে খুব তৎপর হয়ে ওঠে।

আজও এলো তাড়াতাড়ি কোট জুতো খুলে দিতে। হাত নেড়ে তাকে বারণ করে নিজেই জুতোটা খুলে সৌরেশ আদেশ দেয়, "যা রান্না করেছিস তুই খেয়ে টেয়ে নিস, আমি খাব না।"

"খাবেন না? সে কি বাবু, এত কষ্ট করে করলাম!"

সৌরেশ সহসা বেদম হেসে উঠে, "কষ্ট করে করেছিস, সে তো সার্থকই হবে রে! নিজের ভোগে লাগবে।"

"কি যে বলেন বাবু! খাবেন না কেন, দেহ ভাল নেই?"

"ভাল নেই কি রে, ভীষণ ভাল আছে। আজ বিরাট একটা ভোজ খেয়ে এলাম যে।"

"ভোজ!" চাকরটা অবিশ্বাসের সুরে বলে, "আপনাকে দেখে তো মনে হচ্ছে না বাবু ভোজ খেয়েছেন। খেলেন কোথায়?"

"শ্বশুর বাড়ি! শ্বশুর বাড়ি!" ফের হেসে ওঠে সৌরেশ।

"ভাল বললেন বাবু!" বলে চলে যায় চাকরটা। মনে বুঝেছে নির্ঘাত হোটেলে খানা খেয়ে এসেছেন সাহেব, এখন এই ঢং।

আলোটা নিভিয়ে দেবার আগে একবার ঘরের চারিদিক দেখে নিল সৌরেশ। হয়তো রোজই নেয়। হয়তো রোজই বুকসেলফের ওপর রাখা লাল হলদে সবুজ নানা রঙে চিত্তির করা মাটির সরা দু'খানা আজকের মতই অনেকক্ষণ ধরে দেখে। এমনি দাঁড় করিয়ে রাখা আছে সরা দু'খানা, লতাপাতা চিত্তিরের মধ্যবর্তী মূল ছবিটি হচ্ছে দুটি সাঁওতাল যুবক যুবতীর। মেয়েটির চুলে ফুল গোঁজা, মুখে বিচিত্র হাসি, ভঙ্গী স্থির। ছেলেটির গলায় মাদল, দেহ ভঙ্গীতে উদ্দণ্ড

নৃত্যের ছন্দাভাস। খুব একটা কিছু মৌলিক আইডিয়া নয়, তবু ছবি দুটো ভারি আকর্ষণীয়। যে দেখেছে প্রশংসা করেছে। অবশ্য সৌরেশ নিজে বাদে। সৌরেশ বলেছিল, "মেয়েটার দেহের রেখায় রেখায়ও একটা গতির ভঙ্গী থাকা উচিত ছিল। যেন দুজনে দুজনের দিকে ছুটে এগিয়ে আসছে!"

সুচেতা মুখ বাঁকিয়ে বলেছিল, "তাই বৈ কি! দুজনে দুজনের দিকে। মেয়েরা কক্ষনো ও রকম না। মেয়েরা সব সময় সভ্য সুস্থির, নিজের কেন্দ্রে অটল। জগতের ছেলেগুলোই হচ্ছে হাড় লোভী!"

মনে মনে হেসেছিল সেদিন সৌরেশ। পুরুষরা নাকি নিতান্ত সজ্জন তাই মুখের উপর স্পষ্ট কথা বলে ওঠে না। অসীম করুণায় মেয়েদের সমস্ত 'ঔদ্ধত্য' আর অগাধ নির্লজ্জতা ক্ষমা করে—অবোধ সেজে, বেহুঁশ সেজে। যেন মেনেই নিচ্ছে মেয়েদের সমস্ত অভিযোগ। প্রকৃত কথা বোঝবার ক্ষমতা তাদের নেই। এই তো তাদের দুজনের ক্ষেত্রেই এগিয়ে আসার ব্যাপারে—

আলোটা নিভিয়ে দিল সৌরেশ। আর সঙ্গে সঙ্গে যেন সেই নিঃসীম অন্ধকারের মাঝখানে একটা আলো জ্বলে উঠল। সে আলোর রং নেই উগ্রতা নেই, শুধু যেন শান্ত হয়ে সর্বত্র ছড়িয়ে আছে, যাতে সব কিছু দেখা যাচ্ছে।

'স্মৃতির আলো' কথাটার তাহলে সত্যতা আছে? সে আলোয় ভুলে-যাওয়া অতীত সহসা জেগে ওঠে? তীব্র হয়ে নয়, প্রবল হয়ে নয়, স্পষ্ট হয়েও নয়। শুধু ছায়াছবির মত কারা যেন অভিনয় করে সেই আলোক প্রাঙ্গনে, দর্শকের মত দূর থেকে বসে দেখা যায় সে অভিনয়।

'এগিয়ে আসার' কথায় সেদিন আর তর্ক তোলে নি সৌরেশ। জানতো এ তর্কে আহত হবে সুচেতা, অপমানিত হবে। নইলে তর্কই তো ছিল তাদের সবসময়ের আলাপের সুর।

শুধু যখন এমনি আলো নিভিয়ে দিতো সৌরেশ !

যখন দিনের হাট-বাট মাট-ঘাট পার হয়ে এসে রাতের নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়তো দু'জনে ! যে নদীর অকুল জলে সমস্ত পৃথিবী বিলুপ্ত হয়ে যায়, জেগে থাকে দুধের ফেনার মত সাদা, মাখনের মত নরম, একটি উষ্ণ শয্যার চর ! তখন সব তর্ক, সব গোলমাল, সব খুনসুটি আর ছেলেমানুষী স্তব্ধ হয়ে যেত ! দুটি ব্যাকুল প্রাণ এতটুকু একটু চরের আশ্রয়ে নিবিড় হতে হতে নিবিড়তম হয়ে যেত।

আশ্চর্য ! আশ্চর্য !

সেই গাঢ় গভীর আত্মায় আত্মায় স্পর্শের অনুভূতি, সমস্তই মিথ্যা ? নইলে কি করে সে কথা ভুলে গেল সুচেতা ? কি করে আদালতের মঞ্চে দাঁড়িয়ে বিশ্বসুদ্ধ লোকের সামনে ঘোষণা করতে পারলো, "প্রেমে পড়ে বিয়ে করলেও, বিবাহিত জীবন আমাদের কোনদিনই সুখের ছিল না।" সে নাকি আগে বুঝতে পারে নি যে তার প্রেমাস্পদ একজন ছদ্মবেশী। আসলে লোকটা হৃদয়হীন নিষ্ঠুর মদ্যপ। কে জানে হয়তো বা চরিত্রহীনও।

কিন্তু এই কথাগুলো অবিরত যে মানুষটা উচ্চারণ করে গেছে, সে কি সত্যিই সুচেতা ? না সুচেতার মত দেখতে, মানুষের মত দেখতে একটা শিক্ষিত যান্ত্রিক পুতুল ? হিসেব কিছুতেই মেলাতে পারে না সৌরেশ। হাল ছেড়ে দিয়ে চলে যায় আরো অনেকটা পিছনে। যেখানে প্রথম দেখা হয়েছিল দু'জনের !

না, কোন সভা-সমিতি কি নিমন্ত্রণের আসরে নয়, অথচ মানুষের মেলার মধ্যেই। জনারণ্যই বলা চলে। কী যেন একটা 'হস্ত শিল্প প্রদর্শনী' বোধ হয়। এখন আর তার নাম মনে নেই।

অনেক লোকের মধ্যে অনেক ভীড়ের ঠেশাঠেশিতে একটা স্টলের সামনে দু'জনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে পড়েছিল।

পরে কতদিন বলেছে সৌরেশ, "তুমি বিধাতাকে স্বীকার কর না সুচেতা, কিন্তু আমি করি। একান্ত ভাবেই করি। নইলে মেলায় এত

লোক থাকতে খামোকা আমরা দুজনেই বা পাশাপাশি দাঁড়ালাম কেন?"

সুচেতা বোধ করি তর্ক করবার আর কথা খুঁজে না পেয়ে বলে বসেছিল, "আশ্চর্য কুসংস্কার! তুমি না বিলেত ফেরৎ?"

হেসে ফেলেছিল সৌরেশ। "বিলেত ফেরৎ তা কি? বিলেতের সঙ্গে বিধাতার কোন বৈরী সম্পর্ক আছে না কি?"

"সে কথা হচ্ছে না। ওদেশটা ঘুরে এলে শুনেছি দৃষ্টি পরিচ্ছন্ন হয়, বুদ্ধি স্বচ্ছ হয়।"

"দৃষ্টি পরিচ্ছন্ন আর বুদ্ধি স্বচ্ছ বলেই তো" হেসে বলেছিল সৌরেশ, "বিধাতার হাতকে এত স্পষ্ট দেখতে পাই।"

তারপর আবার তর্ক।

শেষ পর্যন্ত যখন সুচেতা যথাবিধি রেগে লাল হয়ে যেত, উত্তেজনায় কাঁদো কাঁদো হয়ে যেত, তখন সৌরেশকে হারমানার ভান করতেই হতো।

যেমন প্রথম দিন।

সেই স্টলটা ছিল কোন মহিলা প্রতিষ্ঠানের শৌখিন শিল্পের স্টল।

মাকড়সার জালের মত মিহি একটুকরো হাতে-বোনা লেস হাতে নিয়ে সুচেতা তখন বোধ হয় স্বগতোক্তির মতই বলে উঠেছিল, "হাতে বোনা! অদ্ভুত! বিশ্বাস করাই শক্ত! কে বলবে কলের কাজ নয়!"

কাউকে তো উদ্দেশ করে বলে নি সুচেতা. শুধু বিস্ময় প্রকাশ করেছিল মাত্র। কিন্তু সৌরেশ, সভ্যভব্য মার্জিত ভদ্র সৌরেশ, একজন বিলেত ফেরৎ ব্যারিস্টার যুবক সৌরেশ, ফট করে তার উত্তর দিয়ে বসলো।

"ওটা কি হয়েছিল!" ওই হঠাৎ উত্তর দেওয়ার প্রসঙ্গ তুলে পরে ব্যঙ্গ প্রশ্ন করতো সুচেতা।

সৌরেশ বলতো, "নিয়তির নির্দেশ।"

সুচেতা বলতো, "ঘোড়ার-ডিম! ওটা হচ্ছে তোমার বথামির নিদর্শন।"

আসলে যাই হোক, তখন সুচেতার স্বগতোক্তির উত্তর দিয়ে বসলো সৌরেশ, "অবিকল কলের কাজের মত? এইটাই কি আর্টের শেষ কথা?"

অশে পাশে কি কেউ ছিল? নাকি ছিল না?

কে জানে! সে কথা ওরা কোনদিন স্মরণ করতে পারে নি। শুধু সৌরেশ আজ স্মরণ করতে পারে, সঙ্গে সঙ্গে সুর্মা-টানা দুটি কালো চোখে যেন আগুন ঝলসে উঠলো। ঘাড় ফিরিয়ে কয়েক মুহূর্ত সেই অগ্নিবর্ষিনেত্রে সৌরেশের দিকে তাকিয়ে সুচেতা বলল, "আপনার সঙ্গে আর্ট নিয়ে আলোচনা করবার সময় আমার নেই।"

সৌরেশ হেসে বলে, "অলোচনা করতে চাইবার সাহসই কি আমার আছে? আপনি একটা কথা বললেন তাই। সত্যি কী অদ্ভুত বাজে পরিশ্রম বলুন তো, ঠিক কলের মত কাজ করার চেষ্টার মধ্যে? আর কী আশ্চর্য রকমের গতানুগতিক! আপনাদের এইসব নারী সমিতি আর মহিলা-প্রতিষ্ঠানের শিল্পকলার নিদর্শন দেখলে মেজাজ খারাপ হয়ে যায় আমার!"

আর একবার আগুন ঝলসে ওঠে সেই কালো দুই চোখে, "দেখবার জন্যে আপনাকে বোধ হয় কেউ মাথার দিব্যি দিয়ে থাকে?"

"মাথার দিব্যি?" সৌরেশ হেসে ওঠে, "না তা কেউ দেয় বলে তো কই মনে পড়ছে না, তবে এইসব কুটির শিল্প বা হস্তশিল্প প্রদর্শনী—ট্রদর্শনী দেখা আমার একটা শখ। সুযোগ পেলেই দেখি।"

এরপর তো আর সুচেতার কথা বাড়াবার দরকার ছিল না। ছিল কি? তবু ফের কথা বললো সুচেতা। আশেপাশে কেউ আছে কি না, তারা শুনছে কি না, শুনে কৌতুক অনুভব করছে কি না, এসব কিছু না ভেবে বলল। "দেখেন আর সমালোচনা করেন?"

"তাও করি। অনুকূলে, প্রতিকূলে! সত্যি বলতে কি, এই সব লেস্ রুমাল, ব্যাগ বটুয়া, সবই কেমন কৃত্রিম মনে হয়। এর মধ্যে খাঁটি শিল্প কোথায়? উদ্ভাবনীর মৌলিকত্ব কোথায়?"

এতে সুচেতাই যেন অপমানিত হয়েছে এই ভাবে রেগে উঠে চড়া-গলায় বলেছিল, "কী চান আপনি শুনি? আকাশের ফুল?"

"আমি?" সৌরেশ হেসে উঠে বলে, "আমি আবার কি চাইবো? কী মুস্কিল! আমি শুধু বলছি মেয়েদের মধ্যে চেষ্টা আছে, নিষ্ঠা আছে, কষ্ট করবার সাধনা আছে, নেই শুধু মৌলিকত্ব। সেকালের কাঁথা-শিল্পের নমুনাও অনেক দেখেছি—সেই এক ধরণ, এক ছাঁদ। বিভিন্ন জেলা থেকে কাঁথা এসেছে, একই পদ্ধতির স্বাক্ষর বহন করে।"

"আপনি একটি পাগল!" ধমকে ওঠে সুচেতা।

সৌরেশ কি উত্তর দিত কে জানে, কিন্তু উত্তর দেবার আগেই সে তার স্বভাবগত পদ্ধতিতে হেসে উঠলো, সঙ্গে সঙ্গে পাশ থেকে একটি তীক্ষ্ণ নারী কণ্ঠের ছুরিকাঘাত! "আপনাদের হাসিগল্পগুলো স্টলের বাহিরে গিয়ে করুন। অন্যের অসুবিধে ঘটাচ্ছেন কেন?"

চারটি চোখ একসঙ্গে পড়লো সেই তীক্ষ্ণকণ্ঠের অধিকারিণীর প্রতি।

একটি তন্বী বিধবা। নিখুঁৎ মুখ, ফরসা রং, পরিধানে ধবধবে মিহি আর্দির প্লেন ব্লাউস আর থান। তবু সমস্তটা মিলিয়ে একটা অদ্ভুত কাঠিন্য!

মুখ-রাঙা করে সুচেতা দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেল, কিন্তু সৃষ্টিছাড়া সৌরেশ দিব্য সহজ ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে বললো, "হাসি জিনিসটাকে আপনি বরদাস্ত করতে পারেন না বুঝি?"

"তার মানে?" মহিলাটি আরও কঠিন হয়ে ওঠেন। "কী বলতে চান কি আপনি?"

"কি মুস্কিল বলতে কি চাইবো! হাসি দেখে বিরক্ত হলেন তাই—"

হঠাৎ মহিলাটি অস্ফুটে কি একটা বলে গটগট করে এগিয়ে যান সে স্টলটা ছেড়ে।

সৌরেশ একটু দাঁড়িয়ে থেকে, তারপর মৃদুবিচিত্র একটু হেসে মিশিয়ে যায় ভীড়ের মধ্যে।

ঈর্ষা জিনিসটা কি সংঘাতিক ক্রিয়াশীল!

সম্পূর্ণ অপরিচিত দুটি মেয়ে, অথচ ··আর একবার ভাবলো সৌরেশ—শুধুই কি নারীপ্রকৃতি এর জন্য দায়ী? না আমাদের দেশের সমাজ ব্যবস্থা? ওই সুন্দরী তরুণী—খুব সম্ভব ধনীও—বিধবাটি, তাঁর সারাটা জীবন ব্যয় করে চলবেন অন্যের হাসিগল্পের উপর চোখরাঙাতে? এই আমাদের সমাজ!

কিন্তু সেই মেয়েটা গেল কোথায়? মনে হচ্ছে যেন আবার দেখা হবে। কে জানে কেন এই বিশ্বাস!

বিশ্বাসের ফল ফলে।

দেখা সত্যিই হয়। সৌরেশের চেষ্টায় নয়, সুচেতার চেষ্টায়। যদিও সৌরেশ সেকথা কোনদিন তোলে নি। যেমন সরার গায়ে আঁকা ওই ছবিগুলোর ভঙ্গী নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে স্বীকার করেই নিত "মেয়েরা ওরকম নয়, মেয়েরা কখনো এগিয়ে আসে না।"

অথচ এগিয়ে এসেছিল সুচেতাই।

"কী, আপনি এখনো রয়েছেন যে?"

সৌরেশ আলোজ্বলে-ওঠা মুখে বলে ওঠে, "ঠিক একই প্রশ্ন আমিও করতে পারি।"

"আমি তো দেখছি সব কিছু।"

"আমিও তো তাই।"

"আপনার তো ভাল লাগে না। সব বাজে সব গতানুগতিক লাগে।"

"তবু সময়টা কাটলো কিছু।"

"আপনার বুঝি সময় কাটে না?"

"কাটতে চায় না। তাই ছুরি দিয়ে কুচোই।"

অর্থহীন কথা! অকারণ কথা!

তবু কইতে ইচ্ছে হয়। কে যেন কথার শিকল পরিয়ে পরিয়ে ওদের ক্রমশ বন্দী করে ফেলছে, সরে যেতে পারছে না ওরা।

তারপর?

তারপর—কেউ কি বিশ্বাস করবে সেই একটি মাত্র সন্ধ্যায় শুধু অর্থহীন বাক্য বিনিময়ের মধ্য দিয়ে দু'খানি হৃদয় বিনিময় হয়ে গেল?

চারিদিকে আলোকমালা, গা ঘিরে জনসমুদ্র! সমস্ত লুপ্ত হয়ে গেল। রইল শুধু একটি অনুচ্চারিত প্রতিশ্রুতি। যে প্রতিশ্রুতি—"আবার দেখা হবে।"

অথচ যতক্ষণ কথা বলেছিল ওরা, তর্কই করেছিল। প্রথমে সময়ের সদ্ব্যবহার অপব্যবহার নিয়ে, তা থেকে সমাজ, সাহিত্য, রাস্ট্রনীতি, শেষ পর্যন্ত মেলার কুলপী বরফ আর চানাচুর খাওয়া নিয়ে।

প্যাকেটটা হাতে নিয়ে সুচেতা ভুরু কুঁচকে বলে—"ক'বছরের বাসি কে জানে! খেলে অবধারিত মৃত্যু!"

সৌরেশ বলে, "আচ্ছা, আমি এখুনি লিখে দিচ্ছি আপনার জীবনের জন্য আমি দায়ী।"

অগত্যা চানাচুর খেতেই হয়। আর বেঁচেই যখন থাকা গেল, কুলপী নয় কেন?

সুচেতা শিউরে বলে, "ক্ষেপেছেন আপনি? ওই মাটির হাঁড়ির কুলপী? খায় না কি মানুষে?"

"হাজারে হাজারে।" সৌরেশ অম্লান বদনে বলে, "ভীড়টাই দেখুন না তাকিয়ে। আমাদের ছেলেবেলায় আমাদের বাড়িতে একটা মাইনে করা কুলপীওলা ছিল। বাবা কাকাদের জোগাত টাকায় দুটো সিদ্ধির কুলপী, আর আমাদের শিশুবাহিনীর জন্যে বরাদ্দ ছিল এক আনায় দুটো জোলো দুধের খিলি। রোজ খেয়েছি। অথচ দেখুন এখনও বেঁচে আছি।"

"এই সব মালাই কুলপী কোন দুধ থেকে হয়, তা জানেন আপনি?" সুচেতা বলে ঘৃণা মাখানো গলায়।

সৌরেশ সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়, "তা' আর জানি না ! হাসপাতালের কুষ্ঠরোগীদের দুধ থেকে ।"

"তবুও খান ?

"কেন নয় ?" হো হো করে হেসে ওঠে সৌরেশ, "রোগীরা তো এ-দুধ চোখেই দেখে না যে তাদের দৃষ্টির দ্বারাও দূষিত হবে। ভাঁড়ারীর হাত থেকে যথাযথ জায়গায় চলে যায়। তারপর হাত ফিরতে ফিরতে এদের হাতে ।"

"ছাই জানেন।" সুচেতা ঝিলিক দিয়ে ওঠে, এসব হচ্ছে কুষ্ঠ-রোগীদের স্নান করানো ময়লা দুধ ।"

ফের হো হো হাসি। "তাও জানি। বলেছিলেন বোধ হয় আপনার কোন দাদামশাই ? আমাদের দাদামশাইও বলতেন।"

এই হাসিই কাল করেছিল সুচেতার। এই হাসিই ওকে স্থান কাল পাত্র ভুলিয়ে যেন স্ক্রু দিয়ে এঁটে রেখেছিল এখানে।

এমন বেপরোয়া হাসি সুচেতা বোধ হয় আর কখনো দেখে নি। নইলে এত মুগ্ধ হবে কেন ? এত আকৃষ্ট ?

যদিও অনেকদিন অবধি সুচেতার ধারণা ছিল, ছেলেটা একটা বেকার বাউণ্ডুলে, তবু দেখা হবার চেষ্টাটা তো তার দিকেই ছিল জোরালো।

পুরুষ ভগ্নাংশতেও খুসি, মেয়েরা সম্পূর্ণটা পেতে চায়। তাই 'মাঝে মাঝে দেখা হওয়াটা' ক্রমশঃ প্রত্যহে পরিণত হলো সুচেতারই ব্যবস্থাপনায়। কোথায় ?

হাটে মাঠে ঘাটে কোথায় নয় ?

সুচেতার পরিবার এ ঘটনাকে কোন আলোয় নিলো, সে কথা লেখা আছে সুচেতার খাতায়। সে খাতা অনেক লাঞ্ছনা গঞ্জনা, অনেক প্রতিজ্ঞা আর অনেক প্রতিজ্ঞা ভাঙার ইতিহাসে জর্জরিত। কিন্তু

সৌরেশ স্বাধীন, সৌরেশ মুক্ত। তাই তার খাতার পাতায় কোথাও বেদনার স্বাক্ষর নেই। তার প্রত্যেকটি পৃষ্ঠা সোনার জলে লেখা।

তারপর সেই একদিন!

সেই প্রথম দিন! কোথায় যেন জলের ধারে বসেছিল দু'জনে। চাঁদ ছিল পিছনে! পাশাপাশি দুটো ছায়া পড়েছিল জলে।

হঠাৎ সৌরেশ বলে উঠেছিল, "আমি এমন একটা মন্ত্র জানি, যাতে ওই দুটো ছায়া এক হয়ে যায়।"

"মন্ত্র?" অবাক হয়ে ঘাড় ফিরিয়েছিল সুচেতা, আর সঙ্গে সঙ্গে সেই মন্ত্রের কৌশলে এক হয়ে গিয়েছিল ছায়া দুটো।

সুচেতা কি একবারেই মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল?

বোধ হয় না। বোধ হয় না হওয়ার ভান। অথবা চিরকালীন সংস্কারের মৃদু প্রতিবাদ সেটা।

"আঃ, উঃ, ছেড়ে দিন বলছি!"

"উঁহু।" খুব নরম গলায় বলেছিল সৌরেশ—'ছেড়ে দিন' বললে ছাড়া হবে না, যদি বলো 'ছেড়ে দাও', তা'হলে বিবেচনা করে দেখতে পারি।"

কিন্তু ছেড়ে 'দাও' বলার পর কি আর ছাড়ান পাবার ইচ্ছে থাকে?

আর একদিন একটা নামকরা ছবি দেখতে গিয়েছিল দু'জনে মেট্রোতে। প্রস্তাবটা ছিল সুচেতার দিক থেকে, তাই 'হল' থেকে বেরিয়ে এসেই প্রশ্ন করলো সে, "কি রকম দেখলে?"

সৌরেশ গম্ভীর ভাবে বলল, "কি করে বলবো? দেখি নি তো।"

"দেখ নি!"

"কই আর দেখলাম? তোমার দু'হাতে কটা আঙুল তার হিসেব রাখতে রাখতেই তো আড়াইটে ঘণ্টা কেটে গেল।"

"আঃ সত্যি, কি যে অসভ্য তুমি! আমার আঙুলগুলো বোধ হয় অর্দ্ধেক রোগা হয়ে গেল।"

"তাই বা মন্দ কি ! চাঁপার কলিও ভালো, রজনীগন্ধার বৃন্তও সুন্দর !"

"থামো ! বাচালতার একটা সীমা থাকা উচিত।" ধমক দিয়েছিল সুচেতা, তবু ওর চোখে মুখে উপছে উঠেছিল ইন্দ্রধনুর সাতটা রং।

সেই রং সমস্ত মুছে গেল ?

আর গেল শুধু সৌরেশের হঠকারিতায় !

কিন্তু আকাশের সাত রং তো কই চির কালের মত মুছে যায় না।

সেখানেও তো মেঘ জমে, কুয়াশা ছায়, রোদ ওঠে, তবু আবার ঝরে গোধূলির সোনা, আবার ফোটে ভোরের রক্তিমা, আবার ওঠে ইন্দ্রধনু !

মানুষ কি তবে আজও আকাশের কাছে পরাজিত হয়ে আছে ? আকাশের বিশালতাকে আয়ত্ত করতে পারে নি, পায় নি তার অনন্ত প্রাণ শক্তিকে ? পেয়েছে শুধু তার শূন্যতাটুকু ?

অন্ধকারে একা এক টুকরো হাসে সৌরেশ।

আর সেই শূন্যতার মাঝখান দিয়ে জড় বিজ্ঞানের রথ চালিয়ে চালিয়ে সগৌরবে আত্মপ্রসাদের হাসি হাসে মানুষ—'আকাশকে জয় করলাম !' উর্দ্ধলোকের বার্তা আনতে পাঠালাম !' উর্দ্ধলোকের বার্তা আনতে মোহমুক্ত আত্মার অনন্ত জিজ্ঞাসাকে পাঠানোর চেষ্টাটা সেকেলে হয়ে গেছে। এ যুগের বার্তাবাহী মাধ্যম কুকুর আর বানর !

ঘটি দিয়ে কি সমুদ্র মাপা যায় ?

যায় না, তবু স্মৃতির সমুদ্রে স্মরণের ঘটি ডুবিয়ে ডুবিয়েই মাপবার চেষ্টা চলে। এখন শুধু ওই সার হয়েছে।

সুচেতা কেন দিনলিপি রাখে নি ? যে অভ্যাস তার নিরেট নিটোল সেজবৌদির আছে, অথচ সুচেতার নেই !

কিন্তু দিনলিপির প্রয়োজন হঠাৎ হলো কেন সুচেতার? ও কি সাল তারিখের মার্কা দিয়ে নির্ভুল হিসেব রাখতে চায় প্রথম কবে তার পায়ের তলার মাটি নড়ে উঠেছিল?

হয়তো তাই।

এতদিন ধরে কিছুতেই তো মনে করতে পারে নি সুচেতা, প্রথম কবে উঠেছিল ঝড়, দেখা দিয়েছিল প্রলয়ের সূচনা!

কবে মহৎ শিল্পীর আঁকা অপূর্ব সুন্দর ছবিখানার গায়ে কে যেন টেনে দিয়েছিল কালির পোঁচড়া!

না, অনেক ভেবে, অনেক হিসেব কসে কসে ক্লান্ত হয়েও কিছুতেই মনে করতে পারে নি সুচেতা, প্রথম কবে মদ খেয়ে বাড়ি এসেছিল সৌরেশ। আদালতে যা বলেছিল সে একটা আন্দাজে গড়া বাজে তারিখ!

কিন্তু তারিখ নিয়ে কি হবে সুচেতার? সেই তারিখটা থেকে আজকে এই তারিখটা পর্যন্ত যতগুলো দিন আর রাত্রি বহে এসেছে কালের রাস্তা মাড়িয়ে, সেগুলো কি সব মুছে ফেলতে পারবে সুচেতা? তারপর আবার নতুন করে গড়বে সেই দিন রাত্রিগুলোকে?

কে জানে তারিখটা নিয়ে অত মাথা ঘামিয়েছে কেন সুচেতা, এখনো ঘামাচ্ছে। যে তারিখটায় প্রথম মদ খেয়ে বাড়ি এল সৌরেশ।

প্রথমে ধারণা করতে পারে নি সুচেতা, করার কথাও নয়। ভেবেছিল এ একটা ঠাট্টার ঢং সৌরেশের। সুচেতাকে রাগিয়ে দিয়ে রাগ ভাঙাবার ফন্দী।

সৌরেশের ফিরতে দেরী দেখে ঘরবার করছিল সুচেতা, আর ফিরতে দেখে অভিমানে থান থান হয়ে বসে পড়েছিল মিথ্যে মিথ্যে একটা বই হাতে নিয়ে।

গাড়ির শব্দ হলেই বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ানো যে সুচেতার অটুট নিয়ম। আজ সন্ধ্যা থেকে কতবার কত বাজে বাজে গাড়ির শব্দেই না ছুটে ছুটে বেরিয়েছে বারান্দায়, আর শেষ পর্যন্ত তো দাঁড়িয়েই রইল।

অবশেষে এসে দাঁড়ালো প্রিয় পরিচিত গাড়িখানি। দেখলো দরজা খুলে নামলো সৌরেশ। ঠোঁট উল্টে মনে মনে বললো সুচেতা 'দশটা তো বাজে, এত রাত্রে আবার গাড়ি বাইরে ফেলে রাখার দরকার কি ছিল ? গ্যারেজে তুলে ফেললেই হতো ! আর কি দু'জনে বেড়াতে যাবার সময় আছে নাকি ?'

তারপরেই ঘরে এসে সোফায় গিয়ে বসলো।

কিন্তু সিঁড়ি উঠতে যেন অনেক দেরী হচ্ছে সৌরেশের ! ফের নেমে গিয়ে গাড়ি তুলতে গেল না কি ! কিন্তু কই শব্দ কই ?

ভাবতে ভাবতে দরজার কাছে শব্দ হলো জুতোর।

নাঃ এখন আর চট করে কথা বলবে না সুচেতা, যতক্ষণ না. সৌরেশ নিজে সেধে আর সাধ্যসাধনা করে রাগভাঙায় সুচেতার। কিন্তু কই ? সৌরেশ তো তার স্বভাবসিদ্ধ হৈ হৈ ধ্বনিতে ডাক দিয়ে উঠলো না সুচেতাকে ? সেও ঝুপ করে বসে পড়লো আর একটা সোফায়। তারপর মাথাটা কেমন একটু ঝুঁকিয়ে জড়িত গলায় বলে উঠলো, "ও আই সি ! অভিমান! অভিমানিনা ! 'মানিনী'র সঙ্গে কি মেলে সুচেতা ? ফণিনী ?"

বটে ! ঢং ! রাগ ভাঙাবার আর সভ্য কোন পদ্ধতি খুঁজে পেলেন না বাবু ! সুচেতা হাতের বইখানা ফেলে উঠে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণস্বরে বলে উঠল "যথেষ্ঠ হয়েছে, ছ্যাবলামির একটা সীমা থাকা উচিত।"

"সীমা ! সীমা !" তেমনি ভাবেই বলে সৌরেশ, "তোমার খালি সীমারেখা নিয়েই মাথা ঘামানো। আমি কি বাবা সীতাদেবী ? যে গণ্ডির মধ্যে থাকবো ?"

হঠাৎ বুকের মধ্যে কেমন ধড়াস করে ওঠে সুচেতার। ঠাট্টা ? সত্যিই ঠাট্টা ? তবে কিসের একটা তীব্রগন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে ঘরের ধূপ-সুরভিত বাতাসের স্তরে স্তরে ?

কথা বলতে ভয় হচ্ছে, অথচ কথা না বলতে পারাও যে আরও ভয়ের। তাই জোর করে ভয় কাটাতে চেষ্টা করে সুচেতা ধমকের ঝড় তুলে। "কী আদিখ্যেতা হচ্ছে? দেরী হয়েছে বলে কি কেউ তোমায় জেলে দিচ্ছে যে, যা তা করতে বসেছ? কেউ কিছু বলছে না তোমায়, দেরী করেছ কৃতার্থ করেছ। যাও এখন স্নানটান করে নাওগে শীগগির।"

এবার সৌরেশ মুখ তুলে একটু হাসলো। তারপর বললো, "বিশ্বাস করতে পারছো না বুঝি? ভাবছো ঠাট্টা? ঠাট্টা নয়, ঠাট্টা নয়! অনেকদিন তো ভুলেই গিয়েছিলাম। পুরনো বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে হয়ে গেল একচোট। ছাড়লো না।"

"কী? কী বললে? কী বললে তুমি?"

না, এর বেশি আর কিছু বলে নি সুচেতা, বলতে পারে নি। শুধু তাড়া-খাওয়া জন্তুর মতো দিশেহারা হয়ে ছুটে গিয়ে পাশেই শোবার ঘরটায় ঢুকে দরজাটা খিল লাগিয়ে দিল সৌরেশের মুখের সামনে।

তারপর সারারাত ঘরের মধ্যে দাঁতে দাঁত চেপে জেগে কাটালো। দরজা খুললো না। খুলে দেখলো না সামনের মানুষটা কি করলো।

কিন্তু সকালে? সকালে তো খুলতেই হবে।

সকালে আস্তে আস্তে দরজাটা একটুখানি খুলে দেখল। দেখল সোফাটার উপরই পড়ে ঘুমোচ্ছে সৌরেশ সেই বাইরের পোশাকেই।

এলোমেলো চুল, এলোমেলো ভঙ্গী। স্নান করে নি, পোশাক ছাড়ে নি, খায় নি। মায়ায় ভরে গেল মন। আশ্চর্য! চাকরটাই বা কি করছিল? সে তো পারতো ডাকতে।

পারল না রাগ রাখতে। কাছে গিয়ে হেঁট হয়ে গায়ে হাত দিল।

নিথর ঘুম, অনেকটা নাড়া দিতে তবে সাড় জাগলো। আর সাড় জাগতেই তাড়াতাড়ি উঠে বসে যেন মৃদু একটু হাসির ভঙ্গী করে হাই তুললো সৌরেশ।

সুচেতা চুপ।

অপরাধের ছায়ামাত্র কই ওর ভঙ্গীতে?

একটুক্ষণ চুপচাপ, তারপর আর একটু হেসে সৌরেশই কথা বলে উঠলো, "কাল কি করলে বল তো ?"

এ আবার কি! 'কি করলে কাল?' যেন সুচেতাই অসঙ্গত অশোভন কিছু করেছে কাল। মুখ দিয়ে মাত্র উচ্চারিত হলো, "আমি করলাম!"

"তাই তো মনে হচ্ছে। বুঝতে পারি নি এতোটা আপসেট্ হয়ে পড়বে তুমি।"

"বুঝতে পার নি ? বুঝতে পার নি ?" স্তব্ধসমুদ্রে উঠলো উত্তাল তরঙ্গ। "এতে আমি আপসেট হব বুঝতে পার নি তুমি ?"

"এতোটা হবে বুঝতে পারি নি।"

এখন আর রাত্রের অন্ধকার নেই, নেই অতর্কিত আঘাত পাওয়ার ভীতি। সৌরেশের সেই অপরিচিত মূর্তিটাও এখন অদৃশ্য। তাই সুচেতা আপন স্বভাবে সহজ হয়ে ওঠে।

"এতোটা হবো বুঝতে পারে নি ?" হিমের ছুরি দিয়ে কাটা কাটা কথা। "আমার সম্বন্ধে তোমার ধারণটা তাহলে বেশ উঁচুই ছিল বলতে হবে।"

"তোমার সম্বন্ধে আমার ধারণা এর চাইতে অনেক বেশী উঁচু সুচেতা।"

"থাক্! আর কথার ফুলঝুরি ছড়িয়ে কৃতকর্মের কুশ্রীতা ঢাকতে চেষ্টা কোর না। তুমি বলেছ 'পুরোনো বন্ধুদের পাল্লায় পড়েছিলে, তারা ছাড়ল না।' এ তাহলে তোমার পুরোনো অভ্যাস ?"

সৌরেশ মৃদুহেসে বলে, "পুরনো বলে পুরনো! বহু পুরনো! কিন্তু এ কি তুমি জানতে না ?"

"আমি জানতাম!" সুচেতা যেন ফেটে পড়ে, আমি জানতাম তুমি মদ খাও ? তাই জেনে তোমায় বিয়ে করেছি আমি ?"

"কী আশ্চর্য! আমায় সম্পূর্ণ না জেনেই বিয়ে করেছ তুমি, এটা তো জানতাম না। কতদিন তো 'বারে' তোমার ছোড়দার

সঙ্গে দেখা হয়েছে, সে যে তোমায় কোনদিন বলে নি, এটা কি করে ধারণা করবো ?"

"ছোড়দার সঙ্গে দেখা হয়েছে!" সুচেতা হঠাৎ থতমত খেয়ে বলে, "কোথায় দেখা হয়েছে ছোড়দার সঙ্গে ?"

"বললাম তো, 'বারে'। 'বার' কথাটার মানেও জান না বুঝি ?" সৌরেশ অল্প একটু হাসে, "দৈবের নির্বন্ধে তোমার ছোড়দা আর আমি একই পানাগারের সদস্য ছিলাম। তারপর তুমি এলে সাকী পানপাত্র হাতে—"

"মিথ্যে কথা!" কথার মাঝখানে গর্জন করে ওঠে সুচেতা, "মিথ্যে কথা! ছোড়দা কি করতে যাবে সেখানে ?"

"কি করতে ?" সৌরেশ হেসে উঠে। সেই তার চির-অভ্যস্ত হাসি। যে হাসিতে তার ঝকঝকে দাঁতের ওপর পাটিটা ঝলসে ওঠে। "যা করতে সৌরেশ মিত্তির যায়।"

বুকটা কেঁপে ওঠে সুচেতার।

তাই কি? তাই কি—বিয়ের আগে অত ভয়ানক রকমের আপত্তি করেছিল ছোড়দা ? অথচ যে ছোড়দার আপত্তির কোন কারণই ছিল না।

কিন্তু স্পষ্ট করে তো কিছু বলে নি, শুধু সৌরেশকে হতশ্রদ্ধা আর নিন্দাবাদ করে করে মন ভাঙাতে চেষ্টা করেছিল সুচেতার। কিন্তু কেন ? কেন স্পষ্ট করে বলে নি ? নিজের গুণ প্রকাশ হয়ে যাবার ভয়ে ? মনে মনেই যেন আর্তনাদ করে ওঠে সুচেতা—ককখনো না! ককখনো তার ছোড়দা অমন নয়। তাই মুখেও গর্জন করে ওঠে, "ককখনো না—ককখনো ছোড়দা মদ খেতে পারে না।"

সৌরেশ হাত উল্টে হতাশার ভান করে বলে, তা'হলে বোধ করি মদ খেলে মানুষকে দেখতে কেমন দেখায় তাই দেখতে যায়। কিন্তু সেকেলে মেয়েদের মত তোমার এত শুচিবাই কেন বল তো ?

"শুচিবাই! নেশা করাকে খুব একটা মহৎ কাজ ভাবতে না পারলেই সেটা শুচিবাই হলো ?" তীব্রস্বরে বলে সুচেতা।

"কিছুটা হলো বই কি ! মদটা খাবার জিনিস নয় একথা বলতে পারো না তুমি। পৃথিবীর আদিম যুগ থেকে রকেট যুগ পর্যন্ত মদের ফেনিল ধারা অব্যাহত আছে। শুধু যুগে যুগে কালে কালে দেশে দেশে তার রকমফের। জগতে এই মদ্যশিল্পে কত লক্ষ লক্ষ লোক মাথা ঘামাচ্ছে, আর কত কোটি কোটি টাকা উড়ছে, লাফাচ্ছে, ছুটোছুটি করছে, তার খবর রাখো ? রাখ না। রাখলে ভাল করতে। এতটা বিচলিত হতে না।"

"থামো !" ধমক দিয়ে ওঠে সুচেতা, "তুমি এত নীচ, এত জোচ্চোর। মদ যদি পৃথিবীর এমন একটা সুখাদ্যই হয়, দোষ যদি কিছু নেই, তবে কেন বিয়ের আগে তোমার এ মতবাদ প্রচার করো নি ? কেন এতদিন নিজের স্বরূপ লুকিয়ে রেখেছিলে ? কেন আমার সামনে নিয়ে এসে খাবার সাহস হয় নি ? বল কেন ?"

সৌরেশ স্থিরভাবে বলে, "এটা কিন্তু তোমার ঠিক কথা হলো না সুচেতা ! বিয়ের আগে এ মতবাদ প্রচার করবার পরিস্থিতি এসেছে এমন মনে পড়ছে না তো ? এলে ঠিকই করতাম। আর ইচ্ছে করে স্বরূপ লুকিয়ে রেখেছিলাম ওটাও ভুল ধারণা। আর একটা জোরালো নেশায় আচ্ছন্ন ছিলাম বলেই হয়তো পুরনোটার কথা মনেই পড়ে নি। পুরনো বন্ধুদের কাছে গেলামই বা কবে ?"

"ওঃ তাই !" সুচেতা একটু তিক্ত হাসি হাসে। "জোরালো নেশাটার জোর কেটে গেছে তাহলে ?"

"সেটাও সম্পূর্ণ ঠিক নয় সুচেতা ! আবার হয়তো কিছুটা ঠিকও" —সৌরেশ বলে, "যে কোন নেশাই মাঝে মাঝে এক এক সময় ফিকে মেরে আসে, তখন এদিকে ওদিকে চোখ যায়, তখন পুরনো পরিজন বা পরিবেশের জন্যে মনটা একটু কেমন করে ওঠে, তাদের জন্যে বড় একটা কিছু ত্যাগস্বীকার করতে ইচ্ছে করে। কিন্তু তুমি তো শুধু আমার নেশাই নয় সুচেতা, তার চাইতে অনেক—অনেক বেশী, অনেক—অনেক বড়।"

ব্যস! সহসা প্রবলোচ্ছ্বাসে বন্যা আসে, সহসা রূঢ়তা আর রুক্ষতার বাঁধ ভেঙে পড়ে। আর সেই বিপর্যস্ত বাঁধ-ভাঙা নদীর সামনে কেমন অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে সৌরেশ। এতক্ষণে তাকে একটু অপ্রতিভ দেখায়।

অনেকক্ষণ পরে আস্তে আস্তে ওর মাথায় হাত রেখে বলে, "তুচ্ছ ব্যাপারকে ভয়ানক একটা সীরিয়াস ভেবে এত কষ্ট পাচ্ছ কেন সুচেতা? ওঠ, মন ভাল করে ফেল। চান করে আসি, বেশ কিছু খাবার আয়োজন করে ফেল দেখি, ভীষণ খিদে পেয়ে গেছে। কাল রাতে তো খেতেই দিলে না।"

অমনি মনটা বেদনায় টনটন করে উঠলো সুচেতার। মনে পড়ে গেল কাল রাতের খাবারটা টেবিলেই ঢাকা পড়ে আছে, কুকারের মধ্যে বসানই রয়ে গেছে সুচেতা নিজের হাতে শৌখিন পদ্ধতিতে রাঁধা মাংস।

চোখ মুছে উঠে বসলো। সৌরেশের একটা হাত শক্ত করে চেপে ধরে বললো, "আর কখনো এমন কাজ করবে না কথা দাও।"

মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে গেল সৌরেশের অপ্রতিভ অপ্রতিভ হাসিমুখ। এ মুখ সুচেতার একেবারে অপরিচিত। গম্ভীর গলাতেই বললো, "একেবারে প্রপিতামহীদের মত গা ছুঁয়ে শপথ করিয়ে নিতে চাও না কি? ছিঃ!"

হাত ছেড়ে দিয়ে সুচেতাও থমথমে মুখে বললো, "ছিঃ-টা তাহলে আমারই প্রাপ্য?"

"তোমার এ কথার উত্তর পরে দেব। এখন নয়, আজ নয়।"

স্নানের সরঞ্জাম নিয়ে চলে গেল সৌরেশ ওদের সেই ছিমছাম ফিটফাট ছোট্ট বাথরুমটিতে। যেখানে ঢুকলেই সৌরেশের গান পায়।

সুচেতা ভারীমুখে প্রাতরাশের আয়োজন করতে লাগল, আর কেন কে জানে কান খাড়া করে রইল, প্রতিদিনের মত স্নানের ঘর থেকে গানের সুর ভেসে আসছে কি না অনুভব করতে।

প্রথমটা মনে হলো, না আসছে না। চারিদিক কেমন নীরব নীরব। চাকরটা শুদ্ধু স্তব্ধ হয়ে আছে।

কিন্তু তারপর ওকি ?

গান না ? আজও গান গাইছে সৌরেশ ?

লজ্জায় ঘৃণায় মাটিতে মিশিয়ে যেতে ইচ্ছে হলো স্থচেতার। তবে কি লোকটা এমনি অসার ? তবে কি স্থচেতা ভুল করে বসেছে ?

এখন রাগত্বঃখের মাথায় ভুলে গেল স্থচেতা, প্রথম থেকেই সৌরেশের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল সে সৌরেশের বেপরোয়া বাচালতার জন্যেই। সাধারণ সভ্য-ভব্য মার্জিত সামাজিকতার ধার ধারে না সৌরেশ, ধার ধারে না ভাবালুতার। ছকে বাঁধা জীবন তার জন্যে নয়।

না, এখন স্থচেতা শুধু আজকের পটভুমিকাতেই দেখছে সৌরেশকে। তাই যত দেখছে বিস্ময়ে নীল হয়ে যাচ্ছে।

এত বড় অপরাধ করেও যে অপরাধীর ভাব নেই সৌরেশের, এটাই অসহ্য লাগছে স্থচেতার।

কিন্তু এতো মাত্র প্রথম দিন।

সেদিন যে আবার কেমন করে সন্ধি হয়েছিল সে কথা স্থচেতার এখন আর মনে পড়ে না। মনে পড়ছে না সেই তর্কটা উঠেছিল কবে। সেই রাত্রেই ? না পরের দিন, কি তারও পরের দিন ? বোধ হয় যেন কদিন পরেই। তবে তর্কটা যে উঠিয়েছিল সৌরেশ নিজেই তা মনে আছে।

স্থচেতা তারপর সাবধানে সন্তর্পণে এড়িয়ে চলছিল সেই বিশ্রী প্রসঙ্গটা। কেন কে জানে মনের মধ্যে কেমন একটা ভরসা এসে গিয়েছিল, আর বোধ হয় পুরনো বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে যাবে না সৌরেশ। একটা চলন্ত মেঘ তার জীবনের উপর একবার মাত্র একটু ছায়া ফেলে চলে গেছে।

কিন্তু সব ভরসা ভেঙে গেল। সৌরেশ নিজেই তুলল প্রসঙ্গটা।

"সেদিন বলেছিলাম না তোমার উত্তরটা পরে পাবে। আজ দেব সে উত্তর, কিন্তু তার আগে তুমি একটা কথার উত্তর দাও, মদ খাওয়াকে খুব ভয়ানক একটা অপরাধ বলে সত্যি বিশ্বাস করো তুমি ?"

"এ কথার আবার উত্তর দিতে যাবো আমি?" সুচেতা বলে চটে উঠে।

"আহা দিতে দোষ কি ? তবে ভালকরে নিজের মনকে বুঝে দিও। ধরো আমি মাঝে মাঝেই এরকম ঘটনা ঘটাতে থাকলাম, তুমি কিছুতেই সেটা মেনে নিতে পারবে না ?"

সুচেতা একটা জ্বলন্ত ঘৃণার দৃষ্টি হানলো।

"ওঃ। এত গৌরচন্দ্রিকা করে তাহলে এই প্রস্তাব করতে চাইছো যাতে তোমার এই বদভ্যাসের অধিকারটা বজায় থাকে, যাতে তোমার কথার চটকে ভুলে আমি মদের সঙ্গে আপোস করে চলবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বসি কেমন ?"

"কিন্তু সুচেতা, মদের সঙ্গে তুমি আপোস করে নাও নি কি ?"

"তার মানে ?"

আগুনতাতে কাঁচের বাসনের মত ফেটে পড়ে সুচেতা "তোমার এ কথার মানে ?"

"মানে তো কিছু জটিল নয়। এই তো সকালে তোমার ছোড়দা এলো, ভাইবোনে ভাবের তো কিছু অভাব দেখলাম না ? হাসিগল্পের, যত্ন আদরের, কোন ত্রুটিই দেখি নি।"

সুচেতা রাগতে ভুলে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। "ছোড়দা ! ছোড়দার সঙ্গে এর সম্পর্ক কি ?"

"আমি তোমায় প্রমাণ দিয়েছিলাম তোমার ছোড়দাও আমার সঙ্গে একই পাপে পাপী। চাও তো আরো নিখুৎ প্রমাণ দিতে পারি।"

"চুলোয় যাক তোমার প্রমাণ" রেগে আগুন হয়ে ওঠে সুচেতা "ছোড়দা দশ পিপে মদ খাক না, তাতে আমার কি এসে যাচ্ছে ?"

আর ওর রাগে-আগুন মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাসতে থাকে সৌরেশ। নিঃশব্দে কৌতুকের হাসি। না কি নিছক কৌতুকও

নয়, কিছুটা ব্যঙ্গের মিশেল দেওয়া। নইলে ওর আলো ঝলসানো দাঁতটা তেমন স্পষ্ট করে দেখা যাচ্ছে না কেন?

"হাসছো মানে?"

"হাসছি, হাসির উপাদান পেয়ে" সৌরেশ বলে, "যাক এতক্ষণে কথাটা পরিষ্কার হলো। তোমার আসল আপত্তিটা হচ্ছে নিজের কিছু এসে যাওয়া নিয়ে। মানে মদের সঙ্গে ঠিকই আপোস চলে, চলে না শুধু ক্ষতির সঙ্গে। তাই না?"

প্রথমটায় চট করে সৌরেশের কথার অর্থটা ধরতে পারে নি সুচেতা। তারপরই, পরক্ষণেই অর্থ ধরতে পেরে অপমান বোধে একেবারে কালো হয়ে ওঠে। সেই কালো মুখে বলে, "তোমার মত ইতরের সঙ্গে কথা কইতে প্রবৃত্তি নেই আমার। এখন বুঝছি জীবনের শুরুতেই ভুল করেছি।"

"কী যে বল!" সৌরেশ হাসে, "জীবনে যদি যথার্থ কোন নির্ভুল কাজ করে থাকে! তুমি, সে হচ্ছে এই আমাকে বিয়ে করা। 'আমরা দু'জনে ভাসিয়া এসেছি যুগল প্রেমের স্রোতে, অনাদিকালের হৃদয় উৎস হতে'—তুচ্ছ একটা মদের গ্লাস আমাদের কী ক্ষতি করতে পারবে সুচেতা?"

তুচ্ছ!

অন্য কোন ব্যাপার নিয়ে, বা অন্য কারো ব্যাপার নিয়ে তর্ক হলে, সুচেতা ঝেড়ে উঠে তর্ক করতে বসতো, কিন্তু এ হচ্ছে নিজের কথা। প্রাণ ফেটে যাবার মত কথা। কথা বলতে বলতে স্বর রুদ্ধ হয়ে আসছে, চোখ বিশ্বাসঘাতকতা করতে চাইছে। তাই কষ্টে রুদ্ধকণ্ঠকে রুক্ষকরে বলে সুচেতা, "তুচ্ছই যখন, তখন সেটা একেবারে ত্যাগ করে ফেলবার শপথ করে ফেল না কেন?"

"শপথ!" সৌরেশ হেসে ওঠে। "ঘুরে ফিরে আবার সেই শপথ? কিন্তু আমাকে দিয়ে খানিকটা মিথ্যে কথা কইয়ে কি লাভ হবে তোমার সুচেতা? মাতালে কখনও শপথ রক্ষা করে? জগতে কোথাও এর

নজীর আছে শুনেছ ? কী দরকার এই অর্থহীন প্রতিজ্ঞার ? হয়তো কয়েকটা দিন তোমার কাছে সত্যরক্ষা করতে 'বারে'র ত্রিসীমানা দিয়ে হাঁটবো না, বন্ধুদের মুখ দেখবো না, তুমিও নিশ্চিন্ত আমিও পুলকিত। তারপর হঠাৎ হয়তো একদিন সব ভেস্তে যাবে। তার চাইতে তুমিই তোমার এই মিথ্যে কুসংস্কারটা ছাড়ো না ? সেটাই বরং সহজ হবে।"

"সেটাই সহজ হবে !" গর্জে ওঠে সুচেতা, "মদ খাওয়ায় আপত্তিটা কুসংস্কার মাত্র ? এটা বোধকরি তোমার বিলেত বাসের সুশিক্ষা ? কিন্তু তোমার মতন বিলেত ফেরতা ঢের দেখেছি আমি, এত নির্লজ্জ কেউ নয়।"

"ছিঃ সুচেতা, খামোকা বিলেত বেচারাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাচ্ছো কেন তুমি ? বিলেত যাবার অনেক আগে থেকেই আমি এ কুসংস্কার থেকে মুক্ত।"

"বিলে[illegible]রও আগে থেকে তুমি মদ খাও ?" সুচেতা ক্রুদ্ধ বিস্ময়ে হাঁপা[illegible]কে।

"অনেক আগে থেকে" সৌরেশ বলে, "কিন্তু তুমি এত উত্তেজিত হলে কথা বলি কি করে বলো তো সু ? চুপ করে বোসো আগে।"

"কি বলবে তুমি ?" দ্বিগুণ উত্তেজিত হয়েই কথা বলে সুচেতা, "স্কুলে পড়তে পড়তে মদ ধরেছিলে এই বলবে বোধ হয় ?"

"ছাট্‌স্ রাইট ! ঠিক ওই কথাই বলতে যাচ্ছিলাম" বলতে বলতে সৌরেশের চোখটা গভীর অতলস্পর্শি হয়ে ওঠে। সে যেন সুচেতাকে নয়, কাউকেই নয়, যেন শূন্যকে উদ্দেশ করেই বলতে থাকে, "ভারি অদ্ভুত পরিবেশে মানুষ হয়েছিলাম আমি, আমি আর আমার জ্যাঠতুতো খুড়তুতো ভাইরা। সে একটি বাহিনী। আমাদের সেই বাহিনীর একটা আলাদা জগৎ ছিল, সেখানে বড়রা কচিৎ চোখ ফেলতেন। পুরনো কালের বনেদীবাড়ি, শুনতে পাই নাকি পূর্বপুরুষদের 'রাজা' খেতাব ছিল। সে যাক, তখন আমার সেই শৈশব বাল্যের পট-ভূমিকাটা ছিল এমন একটা সংসারে, ভিতরে ভিতরে যার বনেদ ধ্বসে

পড়েছে, আছে শুধু বনেদীয়ানার মিথ্যা ফাঁকি। কর্তারা সকলেই নেশা করতেন, শুধু মদ নয় আরো কত কিছুর। কিন্তু তালপুকুরে তখন ঘটি ডোবে না, তাই বিলিতি মদের খালি বোতলে দিশী ধেনো ভরে বাহার দিয়ে বসতেন। মদে আর সিদ্ধির সরবতে খুব বেশী তফাৎ বোধ করতেন না তাঁরা, ভাইয়ে ভাইয়ে একই বোতল থেকে মদ ঢেলে খেতেন।···

"আমাদের মা, ঠাকুমা, কাকীমা, জ্যেঠিমারা, জানতেন ওটা পুরুষদের খেতেই হয়। তাদের খাদ্যতালিকারই একটা বিশেষ পদ। আর আমার পিসিমারা?"···এইখানে যেন সৌরেশ একটু সচেতন হয়। সুচেতার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলে, "শুনে তুমি আবায় ফেন্ট হয়ে যাবে না তো? দেখো সাবধান! আমার পিসিমারা যখন বাপের-বাড়ি আসতেন, তখন আমার মা কাকীমাদের ঘৃণাদৃষ্টির আওতা থেকে বাঁচিয়ে চুপি-চুপি ঝিকে দিয়ে সেই সোমসুধারস আনিয়ে চিলেকোঠার ঘরে লুকিয়ে রাখতেন, আর সন্ধ্যার অন্ধকারে চা[illegible]ছাদে বসে তিন বোনে মজলিশ করে পান করতেন। ও[illegible]মন সিটিয়ে যাচ্ছো কেন সুচেতা? গল্পটা তা'হলে শেষ করি কি করে?"

"জাহান্নমে যাক তোমার গল্প! বিয়ের আগে এত গল্প করেছিলে আর এগুলো চেপে রেখেছিলে কেন?" বিষাক্ত বিদ্রূপে গলাটা যেন চিরে যায় সুচেতার, "ভয়ে বোধ হয়?"

"নাঃ এটা তুমি বড্ড বেশী ভুল ভাবছো সু, কোন কিছুর ভয়ে কিছু লুকোবো এটা আমার ধাতে নেই, অন্ততঃ পিসিদের কাছ থেকে ও গুণটা পাই নি।"

"উঃ!" সুচেতা যেন ছটফটিয়ে ওঠে, "হাত জোড় করছি, দোহাই তোমার! তোমার ওই পিসিদের গল্প আর কোরো না আমার কাছে। কী জঘন্য! কি কুৎসিত!" হঠাৎ উঠে কুঁজো থেকে একগ্লাস জল ঢেলে মাথায় খানিকটা থাবড়ে নেয় সুচেতা।

এবার সৌরেশ একটু গম্ভীর হয়। গম্ভীর ভাবেই বলে, "দেখ সু, পৃথিবীতে চরে বেড়াতে হলে, জোরালো স্বাস্থ্যের প্রয়োজন, শুধু

দেহের নয়, মনেরও। যে স্বাস্থ্য সব কিছু সহ্য করবার ক্ষমতা রাখে। পৃথিবীটা মোমের নয়, মাটির! এখানে যেমন ভালবাসা আছে, ক্ষমা আছে, উদারতা আছে, মানবতা আছে, তেমনি ক্ষুদ্রতা আছে, নীচতা আছে, দুর্নীতি আছে, পাপ আছে, অশোভনতা আছে, অশ্লীলতা আছে। সমস্ত কিছু নিয়েই পৃথিবী। এইটুকুতেই বিচলিত হয়ে মাথায় জল থাবড়াতে বসলে. সমুদ্রের জলেও কুলোবে না যে! পিসিমাদের আমি দোষ দিই কি করে? তারাও তো আমাদের মতই জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই দেখেছে ওই সোমরসই হচ্ছে জগতের সেরা রস। ওই রসের মহিমায় বৈঠকখানা ঘরে আনন্দের জোয়ার বয়, উচ্চ হাসির বান ডাকে। অত যে রগচটা বদমেজাজী কর্তারা, তাঁরাও তখন সহৃদয় হয়ে ওঠেন, খুসি হলে বাড়ির চাকরকে গা থেকে কাশ্মীরী শালখানা খুলে বখশীস দিয়ে বসেন। কী সেই অপূর্ব সুধা যাতে প্রাণের দরজা খু[illegible] এ কৌতূহল হওয়াই স্বাভাবিক। সেই কৌতূহলেই আমার [illegible] ভাই, জানো তো তুমি—সেই সনৎদা, বিয়ের [illegible]র যে তোম[illegible] শাড়ি আর মিষ্টি পাঠিয়ে দিয়েছিল, সে একদিন চিলেকোঠা[illegible]কে চুরি করে আনল একটা বোতল। তারপর কী সেই রোমা[illegible] কী সেই বুক ধুকপুকনি!"— হেসে ওঠে সৌরেশ 'সে রীতিমত এক এ্যাডভেঞ্চার! রান্নাবাড়ির পিছনে একটুকরো পোড়ো জমি ছিল, যেটা কতকগুলো বাজে গাছপালা আর সংসারের সমস্ত আবর্জনার ধারক হয়ে পড়েছিল, সেইখানে আমাদের মদ্যপান-নাট্যাভিনয়ের হাতেখড়ি হোল।"

"চমৎকার!" বিতৃষ্ণায় মুখ বিষিয়ে ওঠে সুচেতার।

"তা যা বলেছ" সৌরেশ হাসে "ভীষণ চমৎকারই লেগেছিল সেদিন। যদিও মুখে ঠেকিয়েই বেদম বমি করে ফেলেছিলাম, আর অবাক হয়ে ভেবেছিলাম, এই জিনিস ওরা এত আহ্লাদ করে খায়? এমন কি এ সন্দেহও হয়েছিল সনৎদা ভুল করে কোন তেতো বিচ্ছিরি ওষুধের বোতল নিয়ে গিয়েছে কিনা। তবে সে সন্দেহ ব্যক্ত করি নি, কারণ

বোকামি প্রকাশ হয়ে পড়লে চাঁদা করে চাঁটি লাগাবে সবাই। আমাদের সেই বালক বাহিনীর মধ্যে ওই একটি মোক্ষম শাস্তির ব্যবস্থা ছিল, চাঁদা করে চাঁটি ! ওর চাইতে অপমান আর নেই। সেই অপমানের ভয়ে, দলপতির কতো অত্যাচার কতো নিষ্ঠুরতা যে সহ্য করেছি তার ইয়ত্তা নেই। তার অন্যায় হুকুমও মানতে হয়েছে অনেক। বলতে কি, সনৎদার এই চৌর্যবৃত্তিও তারই নির্দেশে। দলপতি হচ্ছেন পিসতুতো ভাই বিপিনদা। সেই বয়সেই অনেক কিছুতেই পরিপক্ক ছিল সে। তারপর প্রায়ই চলতে লাগলো চুরি। এদিকে যাদের জিনিস চুরি যায় তারা টুঁ শব্দটি করতে পারে না। কিল খেয়ে কিল চুরি করে, নিঃশব্দে চোরের মার কান্না কাঁদে। মনে হয় পিসিরা সন্দেহ করতো ঝি চাকরদের। কারণে অকারণে ঝি চাকরদের বকাঝকার মাত্রা বেড়ে গেল। সেও এক মজা ! সেই মজার আস্বাদ সুখ থেকে কখন যে মদের আস্বাদটাও সুখের হয়ে দাঁড়ালো [illegible]”

“তোমার এই গল্পটা শুনে মনে হচ্ছে” [illegible] “কোন বর্বর জাতির গল্প শুনছি। কোন ভদ্র ঘরে [illegible] এ রকম [illegible] ঘটতে পারে, এ আমার ধারণার বাইরে।”

“ভদ্র ঘরে যে আরো কত ভয়ানক ভয়ানক ঘটনা সংঘটিত হতে পারে, সে ধারণা তোমার থাকবার কথা নয় সুচেতা। তবে তোমার উকিল জামাইবাবুর কাছে কিছু জ্ঞান সঞ্চয় করলে পার। নানা রকম কেস আসে, তাতে অনেক নাটক অনেক প্রহসনের সন্ধান মেলে। শুনলে জ্ঞান জন্মায়।

“কেন ? এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ না করলে জীবন বিফল হবে ?”

“তা অবশ্য নয়, তবে—” সৌরেশ বলে, “বাঘ ভালুক সাপ শকুনের চেহারাগুলো জানা থাকলে, আর আরশোলা দেখে মূর্চ্ছা যেতে না। আমাদের বাড়ির ওপরওলারা শুধু নিজেদের পানাসক্তি আর গানাসক্তি নিয়েই মশগুল থাকতেন, আর কোন ঝঞ্ঝাট ছিল না তাঁদের। বারোমাসই দেশ-বিদেশ থেকে বড় বড় গাইয়ে বাজিয়ে আসতো

বাড়িতে, মাঝে মাঝে বিখ্যাত বাইজীরাও। তাঁদের আদর আপ্যায়নের রসদ জোগাতে জোগাতে তালপুকুরে আর ঝিনুকও ডুবতে চাইল না। বনেদে দ্রুত ভাঙন ধরলো।

"প্রথম দিকে ঠাটটা বজায় ছিল, ক্রমশ ঠাট বজায় রাখাটাই ঠাট্টার সামিল হয়ে দাঁড়ালো। পূজোর ঘটাটা রইল সমান, কিন্তু দেনায় মাথার চুল বিকোলো। আশ্বিনে দুর্গা প্রতিমা গড়ে কুমোররা পরের বছর ভাদ্র অবধি দামের জন্যে হাঁটিহাটি করতে থাকে, ঢাকীঢুলিরা রোজ একবার করে দরজায় ঢোল বাজিয়ে তাগাদা জানিয়ে যায়, মুদি এসে হাতজোড় করে, গয়লা গালাগাল করতে এসে দ্বারোয়ানের হাতের জুতো খেয়ে ফেরে। চাকর দ্বারোয়ানরাও অবশ্য নিয়মিত মাইনে পায় না, তবু অপর খাতককে উৎপীড়ন করতে ছাড়ে না।

"এরপর জমিদারী কোর্ট অব ওয়ার্ডসে উঠলো, ক্রমে পূজো পার্বণ বন্ধ হয়ে গেল। আমরাই দেখলাম। বিশেষ পার্বণের দিনে দিনে বাড়ির গিন্নীরা ঠাকুরবাড়িতে এসে চোখের জল ফেলতেন, আর দুর্গাপূজোর তিন দিন মাটির প্রতিমার বদলে একটা ঘটস্থাপনা করে একটা প্রদীপ জ্বেলে রেখে দেওয়া হতো। সংসারে নানা দুর্বিপাক ঘটতে লাগল, কষ্টে অপমানে কর্তারা ঝপাঝপ দেহরক্ষা করলেন, গিন্নীরা বিধবা হয়ে কেউ বাপের বাড়ি পালালেন, কেউ ইঁট আগলে পড়ে থাকলেন। আমি এই পরিমণ্ডলের গোকুলে বাড়তে লাগলাম, আমার সব 'তুতো' ভাইদের সঙ্গে। হ্যাঁ বলতে ভুলে গেছি, আমাদের বাড়িতে আত্মরক্ষা বা জান মান রক্ষার চেতনা না থাকলেও আচার আচরণের রক্ষনশীলতার প্রতি দৃষ্টিটা ছিল প্রখর। দশ এগারো বছর বয়েস থেকেই আমরা অন্তঃপুরের আওতা থেকে বিতাড়িত। বৈঠকখানা বাড়ির একাংশ আমাদের এলাকা। মাতৃক্রোড় থেকে ভৃত্যক্রোড় এবং ভৃত্যক্রোড় থেকে 'তুতো' দাদা কাকাদের শাসিত জগৎ—এই হচ্ছে সে বাড়ির ছেলেদের আশ্রয়। মেয়েদের রাজ্যে তাদের প্রবেশ নিষেধ সেই বাল্যকাল থেকেই। কাজেই 'তুতো' বোনদের সঙ্গে কোন

সম্পর্কই ছিল না আমাদের। ভালই হয়েছিল কি বল? আমি আবার একটু দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ ছিলাম কি না! বাড়ির প্রথানুযায়ী মেয়েদের সম্বন্ধে শুধু তাচ্ছিল্য আর অবহেলার ভাব পোষণ করতে আমার কেমন বাধতো। মনে আছে, নেহাৎ যখন ছোট আমি, কি কথায় বিপিনদা একদিন বলেছিল, 'মেয়েছেলের কথা বাদ দে, ওরা আবার মানুষ নাকি?' সেদিন আমি ঘোরতর তর্ক তুলেছিলাম মেয়েমানুষদের মানবত্বর প্রমাণ নিয়ে। কিন্তু শেষ অবধি তর্কে জিততে পারি নি, চাঁদার চাঁটি খেয়ে কেঁদে চুপ করতে হয়েছে। বিপিনদা আর তার অনুগতদের দিকে শ্রেষ্ঠ যুক্তি ছিল 'মেয়েমানুষ যদি মানুষ হবে, তাহলে—' নাঃ থাক এটা আর তোমার সামনে বলবো না। তুমি হয়তো উঠেই যাবে। সে যাই হোক, অন্দরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ছিল শুধু দু'বেলা খাবার সময়। ভিতর বাড়ির দালানে ঠাঁই করা হতো, বামুন ঠাকুর পরিবেশন করতো, একটা চাকর গিয়ে আমাদের ডাক দিয়ে আসতো। সে সময় বুঝতে পারা যেত কে কার আত্মজন! সেও এক লজ্জার পরিস্থিতি। বাড়ির মহিলার দল এখন এসে বসতেন ছেলেদের খাওয়ার তদারক করতে। আর চলতো নির্লজ্জতার পাঠ। প্রত্যেকদিনই মনে হতো, ওঁরা কেন সামনে এসে বসেন। ঠাকুর যদি বৈঠকখানা বাড়ির দালানে আমাদের খেতে দিয়ে আসে তো বেশ হয়। কারণ, শুধু ওই পরিবেশক ঠাকুরটাকে মাধ্যম করে মহিলারা নিজেদের চরিত্রের যে দিকটা উদ্‌ঘাটিত করতেন, সেটা আর যাই হোক—শ্রদ্ধাযোগ্য নয়।

"বড়মার ধারণা ছিল, যেহেতু তিনি বড়, সেইহেতুই তাঁর সন্তানবর্গের দুধ-মাছ দই-মিষ্টির বরাদ্দটা বেশী হওয়া উচিত, অথচ সেই উচিত ব্যবস্থাটা কিছুতেই হয় না। অতএব বামুন ঠাকুরকে প্রশ্ন করতেন তিনি, 'অত বড় বড় মাছ যে কোটা হলো, সে সব গেল কোথায়? তাঁর ছেলেরা চারখানা বৈ পায় না কেন? এ বাড়িতে কি মুড়ি মিশ্রীর এক দর?' আমার মায়ের ধারণা ছিল যেহেতু তাঁর

দিকে ভাগের ভাগীদার মাত্র আমি একা, সেইহেতু ওঁদের এক একজনের সাত আটটি ছেলের সঙ্গে সমতা রেখে আমার পাতে পরিবেশিত হোক। আমার ভোজনশক্তি এবং হজমশক্তির উপর সে এক অকথ্য উৎপীড়ন। মাছের মুড়ো খেতে গেলেই যে আমার গলায় কাঁটা বাধে, এ সত্য মানতে আমার মা আদৌ রাজী হতেন না, তাই বামুন ঠাকুরকে তিনি প্রত্যহই প্রশ্ন করতেন 'তাঁর ছেলের মাসে একদিনও মাছের মুড়ো প্রাপ্য হয় কি না।' আর বিধবা যে পিসিমা বাড়িতে থাকতেন—ওই যে বিপিনদা নেপেনদার মা, তাঁর ধারণা ছিল, ঠাকুর সর্বদাই তাঁর ছেলেদের প্রতি অবিচার করে, যেহেতু তারা আশ্রিত। তাই সহসা সহসা তাঁর গুপ্ত সঞ্চয়ের ভাণ্ডার থেকে নানাবিধ সুখাদ্য বার করে এনে এনে ছেলেদের পাতে ঢেলে দিয়ে খাবার জন্যে মাথার দিব্য দিতেন। আর কাকীমারা, তাঁরা প্রায়শঃই সরাসর হুকুম করতেন 'বামুন ঠাকুর এর পাতে আর খানকতক ভাজা মাছ দিয়ে যাও দিকি। ঠাকুর এ দাদাবাবুকে ক্ষীর এত কম দিয়েছ কেন বল তো? গরুগুলো কি দুধ দেওয়া বন্ধ করেছে? যাও ক্ষীরের কড়াটা এখানে নিয়ে এস। ...আচ্ছা ঠাকুর! কতদিন বলেছি অমুক দাদাবাবু মাংস খেতে ভালবাসে, ওকে বড় বাটিতে মাংস দিও, এত কিপ্‌টুনি করে পরিবেশন করবার মানে কি? এ সংসারে কি ছোট বাবুর ভাগ নেই?' বড় বেশী অবাক লাগছে তোমার, না সুচেতা? কেন কে জানে হঠাৎ কি রকম খেয়াল হচ্ছে তোমাকে ছেলেবেলার কথা বলতে ইচ্ছে করছে। বলতে ভাল লাগছে। এ সব ছোট কথা বলার অবশ্য কোন অর্থ নেই, শুধু পরিবেশটা বোঝাবার জন্যেই—"

এতক্ষণে সুচেতা হাসে। হেসে বলে, "বলে যাও। এই ছোট কথাগুলোর জন্যে অন্ততঃ খুব বেশী অবাক হচ্ছি না। এটা মেয়েদের স্বধর্ম। নিজেদের স্বামীপুত্রের স্বার্থরক্ষাকল্পে তাদের নির্লজ্জ হতে বাধে না, ছোট হতে বাধে না, অভদ্র হতে বাধে না।"

"তুমি দেখেছো এ রকম?" সৌরেশ বলে।

"না দেখেছি এমন নয়। তবে প্রকাশভঙ্গীর ভঙ্গীটা হয়তো সকলের সমান নয়, কারো বা সরাসর নির্লজ্জ, কারো বা পালিশ লাগানো অন্তঃসলিলা। আমাদের বাড়িতেও 'মাছের ক্ষুদ্রতা' নিয়ে আলোচনার ক্ষুদ্রতা দেখেছি বৈ কি।"

হঠাৎ কখন প্রতিপক্ষতার বিপরীত শিবির থেকে সমব্যথিত্বের সমতলে এসে দাঁড়িয়েছে সুচেতা।

সৌরেশ বলে, "এই ক্ষুদ্রতাটা হৃদয়ে বড় শেল হানতো। বৈঠকখানা বাড়িতে এসে বাঁচতাম। কিন্তু সেখানেও বাঁচার উপাদানের চাইতে মরার উপাদানের চাষই বেশী। আমাদের সেই আসরে দাবা ছিল, পাশা ছিল, বাজী ধরে তাসের জুয়া খেলা ছিল, বড়দের অনুকরণে ত্রুটি ছিল না কিছু। চাকরদের পয়সা ঘুষ দিয়ে দোক্তা দিয়ে দিয়ে পান সাজিয়ে নেওয়া হতো, ধূমপানের অবাধ অধিকারে সকলে নিজেদেরকে কর্তাদের সমতুল্য মনে করে আনন্দে অধীর হতাম, এবং মাঝে মাঝেই বোতল বাহিনীর আমদানীতে—ঝিমিয়ে পড়া জীবনে বেশ এক একটি উত্তাল তরঙ্গ উঠতো। বড়রা কেউ কোনদিন আমাদের এই বিকৃত জীবনযাত্রার দিকে চোখ ফেলতে আসতেন না, নিজেদের বিকৃতি নিয়েই মত্ত তাঁরা। মাইনে করে মাস্টার রেখে দিয়েছিলেন, ছেলে পিছু এক একটা করে, এর বেশী আর কি করবেন? কী করতে পারেন? যাই হোক—তবু ওরই মধ্যে কারো কারো পড়ালেখা কিছু এগলো, আমিও তার মধ্যে একজন। আমি স্কুলের গণ্ডি ছাড়লাম। এই সময় একদিন আমার বড় মামা গিয়ে পড়ে বহু বকাবকি করে মাকে আর আমাকে নিয়ে চলে এলেন। বাবা তো তার আগেই গেছেন। মামারই প্রেরণায় বা তাড়নায় আরো কিছুদূর এগিয়ে, একদিন সমুদ্রে পাড়ি দিলাম।"

সুচেতার বিরক্তির মেঘ কখন যেন সরে গেছে, গল্প শোনার কৌতূহল নিয়েই প্রশ্ন করে সে, "তা তালপুকুরে তো ঝিনুক ডুবছিল না, বিলেত যাওয়ার খরচ এল কোথা থেকে? মামা দিলেন?"

"না, না, মামা কোথায় পাবেন? মামার ভাঁড়ারে মানসিক দৃঢ়তা, আর মার্জিত রুচি ছাড়া আর কোন রেস্ত ছিল না। খরচ এমনি জুটলোই। আসলে কি জানো সুচেতা, সেই যে বলে না, 'মরা হাতী লাখ টাকা', বলে 'বড় গোলার তলা!' এও তাই। বিলাসিতার জোগান দেবার ক্ষমতা হারালেও এস্টেট থেকে আমাদের যা মাসোহারা আসতো, তাও নেহাৎ কম নয়। মামার বাড়িতে আর যাই হোক বিলাসিতা করবার সুযোগ ছিল না কিছু। আমার মাকে চন্দ্রকোণার মিহি থান ছেড়ে খদ্দরের মোটা থান ধরতে হয়েছিল, ক্ষীর তুধ মাখন ছানার বরাদ্দে ছাঁটাই পড়েছিল অনেকটা। মামার সংসারের চালেই চলতে হতো তাঁকে। এবং আমাকেও। তাছাড়া মস্ত সুবিধে—আমি মা বাপের এক সন্তান। আমার ভাগ থেকে আর ভাগ কাটা পড়ে নি। কাজেই সমুদ্র পথের পাথেয় জোগাড় হয়েই গেল।

"তারপর—বিলেত থেকে ফিরে এসে দেখলাম, মা ইতিমধ্যে বাবার অনুসরণ করেছেন, আমাকে জানানো হয় নি। দেখলাম মামা রিটায়ার করেছেন, এবং মামা মামী পণ্ডিচেরীতে গিয়ে বাস করবার ব্যবস্থা করে ফেলেছেন। নিঃসন্তান তাঁরা, এ সংকল্পে অস্থির হবার কেউ নেই। টাকাপত্র নিয়ে অগত্যা আমি আমার বনেদী বাড়ির অংশ টংশ বেচে এস্টেটের কাছ থেকে পূর্বজীবনের উপর বিরাট এক দাঁড়ি টেনে দিয়ে ঝাড়া হাত পা হয়ে বসলাম। তার পরের কথা তো তুমিই জানো সব। তারপর আমার জীবনে তুমি এলে 'উদয় শিখরে সূর্যের মত'!

"থাক্ হয়েছে। জানো তো খালি বানানো চারটি কথা"!

সূর্যের কিরণসমুদ্র ঝাঁপিয়ে এসে পড়লো মাটির বুকে। আবেগের উত্তাল তরঙ্গে ভেসে গেল সন্দেহের খড়কুটো জঞ্জাল। মনে হলো দু'জনেই বুঝি সূর্যস্নান করে উঠলো।

এবং পরবর্তী ব্যবহারে মনে হল প্রেমের স্বাদকে আরও স্বাদু করে তুলতে, মাঝে মাঝে কলহ আর সন্দেহেরও বুঝি প্রয়োজন আছে।

কিন্তু এ তো শুধু প্রথমবার !

আবারও তো ঘটল পুনরাবৃত্তি। বারে বারেই ঘটতে থাকলো। কী এক সর্বনাশা বুনো জেদ চেপেছে সৌরেশের, সুচেতাকে সে ভালবাসার পরীক্ষায় জয়ী করে ছাড়বেই। যাকে সুচেতা ভালবাসবে, তাকে যেন তার সমস্ত দোষত্রুটি ভুলভ্রান্তি সমেতই ভালবাসতে পারে। যে মুহূর্তে সুচেতার এই শুচিবাই যাবে, সেই মুহূর্ত থেকেই তুচ্ছ এই অভ্যাসটাকে চিরতরে ত্যাগ করবে সৌরেশ, বিনা প্রতিজ্ঞায় বিনা শপথে। ত্যাগ করা সৌরেশের কাছে কিছুই নয়। তাই বলে সুচেতার ভালবাসা হারাবার ভয়ে ত্যাগ করবে না। কিছুতেই না।

দ্বিতীয়বার যেদিন এই নাটকের পুনরাভিনয় হল, সেদিনের কথাও স্পষ্ট মনে আছে দুজনেরই।

এবারে আর ভূতাহতের মত পালিয়ে যায় নি সুচেতা, খাটের বাজুটা মুঠোয় চেপে ঠিক কাঠের মত কঠিন হয়ে গিয়েছিল। চোয়ালের পেশীগুলো আরো কঠিন আরো কঠোর !

"আবার ! আবারও তুমি ?"

প্রথমে শুধু এই কথাটুকুই বলতে পেরেছিল সুচেতা।

সেদিন আর কথার বৈকল্য ঘটে নি সৌরেশের, তাই টুপিটা র‍্যাকে রেখে কৌচে বসে পড়ে টাইটা খুলতে খুলতে অলসভাবে বলেছিল, "ওই কথাটাই আমিও ব্যবহার করতে পারি। আবার ! আবারও তুমি বিচলিত হচ্ছ ?"

সুচেতা তীক্ষ্ণ কটু কণ্ঠে চীৎকার করে উঠল, "ওঃ বিচলিত হবো না ? তুমি তাহলে সংকল্প করেছ এই ভাবেই চালিয়ে যাবে ?"

"ইউ আর রাইট !" মাথা ঝুঁকিয়ে একটু কায়দার ভঙ্গী করে বলে সৌরেশ, "ঠিক বলেছ। যতদিন না তুমি তোমার ছেলেমানুষী ছাড়বে !"

"ছেলেমানুষী !"

"না তো কি ?" সৌরেশ পা দুটো টান টান করে বসে একটা হাই তুলে বলে "আমি তো একে ছেলেমানুষী ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারি না।"

"স্বামীর মাতলামি স্ত্রীর পক্ষে বিরক্তিকর হলে, সেটা হলো ছেলেমানুষী ?" সার্পিনীর মত ফুঁসতে থাকে সুচেতা। "লজ্জা করে না নিজের নীচতা শুধু কথার কায়দা দিয়ে ঢাকতে চেষ্টা করতে ?"

"লজ্জা আমার এতে করছে না সুচেতা," সৌরেশ উঠে দাঁড়িয়ে বলে, "লজ্জা করছে তোমার সহ্যশক্তির ওজন দেখে! কই আমি তো কোন কিছুতেই এত বিচলিত হই না ?"

"তুমি ? তুমি আবার বিচলিত হবে কিসে ? তোমার বিচলিত হবার কি কারণ ঘটেছে ?"

বিস্ময় প্রকাশ না করে পারে না সুচেতা। সৌরেশ ঘর ছেড়ে বেরোবার মুখে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে, "হবার ইচ্ছে হলে কি বিচলিত হবার কারণের অভাব থাকে সুচেতা দেবী ? এই যে তুমি তোমার ওই গোলাপের পাপড়ির মত ঠোঁট আর চাঁপার কলির মত আঙুলের ডগাগুলো টকটকে একটা লাল রঙে ছুপিয়ে রেখে দাও, এই যে তোমার ওই সুন্দর মসৃণ ঘাড়ের ওপর কলসীর বিঁড়ের মত উঁচু খটখটে কুৎসিত একটা খোঁপা বাঁধো, এই যে তোমার মাখনের মত মোলায়েম লোভনীয় পিঠ আর পাঁজরের প্রায় সবটুকুই রাজ্যসুদ্ধ লোকের সামনে মেলে ধরে উদ্ধত ভঙ্গীতে ঘুরে বেড়াও, ইচ্ছে করলে কি আমি এসবে বিচলিত হতে পারতাম না ? কিন্তু হই না।"

"চমৎকার!" বিরক্তিতে মুখটা সিঁটিয়ে তুললো সুচেতা, "মহানুভবতার শেষ নেই তোমার! কিন্তু এসবগুলো বোধ হয় একা সুচেতা মিত্তিরই করে ?"

"আহা তাই কি বলছি ? আর যে যা করে করুক, সুচেতা মিত্তির করলে আমার বিচলিত হবার দাবী আছে তাই বলছি। নইলে মাতাল কি একা সৌরেশ মিত্তিরই হয় ?"

"ওঃ তোমার যুক্তি শুনে মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছি! তাহলে সাজের আধুনিকতা তোমার কাছে মাতলামীর সামিল?"

"সামিল কি গো, বরং বলো বেশী! যারা মদ খেয়ে যা তা করে, তাদের তো তবু বোঝা যায়, কিন্তু যারা মদ না খেয়ে সেটা করে? আচ্ছা, তাদের কাজের কি নাম দেওয়া যায় বল তো? রাজশেখর বসুর 'চলন্তিকায়' নেই কোন শব্দ?"

"তুমি চুপ করবে?"

"চুপ করেই তো থাকতে চাই গো, তুমিই যে কথা বলাও। পাকস্থলীতে কোন একটা উগ্র রসের প্রতিক্রিয়াজনিত লোক-হাসানো আচরণের নাম হল মাতলামী, কেমন? কিন্তু মর্মস্থলীর কোন রসের প্রতিক্রিয়ায় যদি ওই একই আচরণ ঘটতে থাকে, তার একটা নামকরণ হবে না? হওয়া উচিত।"

নির্মল স্বচ্ছ হাসিতে ফেটে পড়েছিল সৌরেশ।

রাগ করে সেদিন খায় নি সুচেতা।

কিন্তু সুচেতার এই রাগে যেন সৌরেশের পরম কৌতুক। তাই শেষ পর্যন্ত সুচেতাকে টেনে তুলেছে। বলেছে, "থাক্ অনেক হয়েছে। সাজে আধুনিক হলেও তুমি এখনো আমার প্রপিতামহীর আমলে আছো, সেই—রাগ করে না খাওয়া! বাড়তি ঘর থাকলে বোধ হয় গোঁসাঘরে গিয়েও ঢুকতে? চায়ের পেয়ালায় তুফান তোলা আর কাকে বলে? চলো চলো বরং একটা সিনেমা দেখে আসা যাক। ভাল হোক রাবিশ হোক যা হোক! যেটা প্রথম চোখে পড়বে, বাংলা ইংরিজি হিন্দি যাই হোক। তার আগে কিন্তু একটা ভালো রেস্তোরাঁয় ঢুকে কিছু খাওয়া। ওটাতে অবিশ্যি যা হোক নয়। কি বল?"

অদ্ভুত সপ্রতিভতা, অদ্ভুত হাসি!

কি করে যে এত অপরাধী হয়েও এত সপ্রতিভ হতে পারে মানুষ, এটা সুচেতার বুদ্ধির অগম্য। শেষ অবধি সেই সিনেমায় নিয়ে গিয়ে ছাড়ল।

রেস্তোরাঁয় ঢুকে খাওয়ানোও বাদ গেল না।

কিন্তু এ তো শুধু দ্বিতীয় বার।

তারপর আরও কত কত বার!

সুচেতা কত রাগল, কত চোখের জল ফেলল, কত অনশন ব্রত করল, কতবার বাপের বাড়ি চলে গেল, কতবার কথা বন্ধ করে কলের পুতুলের মত মৌন মুখে সংসার করতে লাগল, কিন্তু পারল না। পারল না সৌরেশকে শপথ করাতে। মদ ছাড়বার শপথ।

ও খালি হাসে আর বলে, "ছাড়ব, আগে তোমার ভূত ছাড়ুক।"

একদিন, নিতান্ত একটা দুর্বলতার মুহূর্তে, যেদিন না কি মিনতি করেছিল সুচেতা, সেদিন শুধু সৌরেশ হাসে নি। সেদিন ঈষৎ বিমনা হয়ে গিয়েছিল। সেদিন বলেছিল, "দোহাই তোমার সুচেতা, মিনতি কোর না। ওতে আমি জোর হারিয়ে ফেলি। ওটা তোমাকে এত বেমানান লাগে যে, হঠাৎ ভয় ভয় করে।"

তারপর কেমন একটা অন্তরঙ্গ সুরে বলেছিল, "আমার সেই পিসতুতো দাদার কথা তোমায় বলেছিলাম সেদিন, মনে আছে? সেই বিপিনদা? সে বেচারার জন্যেও আমাকে এখন ঘন ঘন 'বারে' যেতে হচ্ছে আজকাল সুচেতা! ওটাও আর একটা কারণ হয়ে উঠেছে।"

"তার মানে?"

ছিটকে উঠেছিল সুচেতা।

"মানে অতি প্রাঞ্জল!" সৌরেশ একটু বিষণ্ণ হেসেছে। "মানে পয়সার অভাবে নেশা করতে পায় না বেচারা, অথচ না পেরে ছটফটিয়ে মরে। বলতে গেলে এটা ওর আজীবনের নেশা! শুকনো শুকনো মুখখানায় আশার আলো জ্বেলে কোর্টের বাইরে রাস্তার ধারে ঘোরাঘুরি করে, আর সুবিধে পেলেই আমায় ধরে। ভারি মায়া হয় বুঝলে?"

সুচেতা সেদিন কিছুক্ষণের জন্যে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। স্তব্ধতা ভাঙলে নিশ্বাস ফেলে বলেছিল, "পৃথিবীতে এত লোক পয়সার অভাবে

ভাত পাচ্ছে না, তাদের জন্যে তোমার মায়া হয় না, একটা নেশাখোর লোক পয়সার অভাবে মদ পাচ্ছে না বলে তোমার মায়া হয়?"

"হয় সুচেতা! যাদের ভাত জোটে না, তাদের মুখের চেহারায় শুধু অভাবের স্বাক্ষর, কিন্তু এদের মুখের প্রতিটি রেখায় রেখায় অভাবের সঙ্গে সঙ্গে সারাজীবনের গ্লানির আর অনুশোচনার স্বাক্ষর! ওদের দেখলে শুধুই দয়া হয়, এদের দেখলে মমতা আসে, করুণা আসে।"

"এতই যদি মমতায় প্রাণ উথলে ওঠে, চারটি টাকা ফেলে দিলেই পারো।"

"তা হয় না সুচেতা! তাতে তার আত্মসম্মানে আঘাত লাগবে।"

"আত্মসম্মান!" সুচেতার ব্যঙ্গের হাসিতে ঘরের হাওয়া টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল।" এসব লোকেরও আত্মসম্মান বোধ থাকে?"

"থাকে বৈকি সুচেতা! সে তুমি বুঝবে না।"

"হার মানছি। স্বীকার করছি বুঝবো না। বুঝতে চাইও না। কিন্তু বলছো তো তোমার দাদা হন তিনি। তা ছোট ভাইয়ের সঙ্গে বসে নেশা করতে তাঁর আত্মসম্মানে বাধে না?"

"এই দেখ মুস্কিল! তা বাধতে যাবে কেন? বলেছি তো এ বিদ্যের তিনিই আমাদের গুরু।"

"অপূর্ব! অপূর্ব! তা হলে তো গুরু দক্ষিণা দেওয়াই উচিত! শুধু ভাবছি আমার ভুলের খেসারতটা দেব কি দিয়ে!"

না, সেদিনেও বিচ্ছেদের মামলা তোলবার কথা ভাবে নি সুচেতা। সত্যি একদিনে দু'দিনে সেকথা ভাববার মতন অতটাই কি পলকা প্রেম তার?

সেদিনে ওকে নিয়ে একটা লম্বা পাড়ি দিতে বেরিয়েছিল সৌরেশ নিজে ড্রাইভ করে। মাইলের পর মাইল। শহরের সীমানা ছাড়িয়ে অনেক দূরে। দুরন্ত বেগে!

শুধু মাঝে মাঝে রাশ একটু ঢিলে দিয়ে কথা!

"শোন সুচেতা, গতিই হচ্ছে জীবনের সকল দুঃখের থেকে মুক্তি! চিন্তার গতি, সাহসের গতি! এমন কি গাড়ির এই গতিতেও মনটা অনেক ভাল হয়ে যায়। পরীক্ষা করে দেখো তুমি। দুরন্ত বেগে ছুটে চল, দেখবে হয়তো যে ব্যাপারটাকে বিরাট একটা কিছু ভেবে দুঃখ পাচ্ছ, সেটা অনেক তুচ্ছ হয়ে গেছে। মন খারাপ হলে লোকে তীর্থভ্রমণে বেরোয়। তীর্থভ্রমণে পুত্রশোকের ভার পর্যন্ত হালকা হয়ে যায় শুনেছি। যায় সে কি তীর্থ-মাহাত্ম্যে? না সুচেতা, গতির মাহাত্ম্যে!"

তা সত্যি!

সেদিন বেড়াতে বেড়াতে মনটা হঠাৎ আগের মতই হালকা হয়ে গিয়েছিল সুচেতার। আর মনে পড়ছিল না 'ভুল করেছি', 'ঠকেছি'। মাঠে নেমে পড়ে ঘাসের উপর বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ আবিষ্কার করেছিল, 'কী আশ্চর্য! এই তো সেই আমি, আর সেই সৌরেশ! দু'জনের মধ্যে ব্যবধান রচনা করবার সাধ্য কার আছে?'

মনে মনে বলেছিল, 'আমরা দুজনে ভাসিয়া এসেছি যুগল প্রেমের স্রোতে'।

পছন্দসই একটা জায়গায় বসে পড়েছিল সুচেতা। আর ওর সেই লাল টকটকে রঙ্ লাগানো উজ্জ্বল মসৃণ লম্বা লম্বা নখের ধার দিয়ে ঘাসের শীষ ছিঁড়তে ছিঁড়তে গানই গেয়ে ফেলেছিল একটা।

নিছক নিখুঁৎ আধুনিক একটি প্রেমের গান।

না, নখে ঠোঁটে রং লাগানো তা বলে ছাড়ে নি সুচেতা। ছাড়ে নি ওর সেই উদ্ধত খোঁপা আর এক বিঘৎ বহরের ব্লাউস।

সৌরেশের কথায় ওগুলো ত্যাগ করা ওর কাছে হাস্যকর ছেলেমানুষী বলে মনে হয়েছিল। অথবা সত্যি বলতে কি, ত্যাগ করার প্রশ্ন ওঠেই নি।

গান শুনে সৌরেশ হেসে বলল, "পরিবেশটা চমৎকার হয়েছে, তাই না? দৈবাৎ যদি কোন চিত্রপরিচালক এখানে এসে পড়তো,

সে নিখরচায় দিব্যি একখানা দৃশ্য তুলে নিতে পারতো! দেখ আয়োজনের কোন ত্রুটি হয় নি। আকাশে চাঁদ আছে, মাঠে গাছ আছে, হয়তো বা এদিক ওদিক কোথাও গাছে ফুলও আছে। আর সামনে ওই যে ডোবাটা? তেমন অ্যাঙ্গেল থেকে ছবি তুললে ওটাই সুন্দর একটা নদী বলে ভ্রম হবে। এই পরিবেশ আর সুসজ্জিত প্রেমিক যুগল, তার ওপর প্রিয়ার মুখে আধুনিক প্রেমসঙ্গীত। এ দৃশ্যের দাম লাখ টাকা। মুফতে যদি এ রকম একটা দৃশ্য তুলে নিতে পারে, যে কোন ছবিতে ঢুকিয়ে দিতে পারবে।"

"যে কোন?" হেসে উঠেছিল সুচেতা। "তেমন অ্যাঙ্গেল থেকে ছবি নিলে হয়তো ডোবাকে—নদী বলে ভ্রম হতে পারে, ডোবাকে নদী বলে ভ্রম হওয়াটা সাধারণ ঘটনা, কিন্তু আমাদের ছবি যে কোন গল্পে ঢুকিয়ে দেবে কি করে?"

"সে যাহোক করে দেবেই ঢুকিয়ে। ফালতু একজোড়া প্রেমিক প্রেমিকা সৃষ্টি করেও দিতে পারে। ধর, হতাশ প্রেমিক অভিমানী নায়ক নিরুদ্দেশ যাত্রায় বেরিয়ে দূর থেকে দেখতে পেল অপরিচিত দুটি নরনারী ভালবাসার পাথারে ডুবে—ইত্যাদি। তারপর অভিমান ভেঙে গেল তার, ছুটে ফিরে গেল নায়িকার কাছে। সে যা হোক একটা গোঁজামিল দেওয়া যায়। গোঁজামিল দেবার অনবদ্য ক্ষমতা আমাদের দেশের চিত্রপরিচালকরা রাখেন। মোট কথা, এ হেন দৃশ্য তো একটা রাখতেই হবে ছবিতে?"

"আহা, আজকাল আর অত নেই। আজকাল ঢের উন্নতি হয়েছে।"

এই অভিমত দিল সুচেতা। আর সেই কথা থেকে কথায় কথায় কখন যেন কথান্তরে চলে গেল দু'জনে। আর এরই মধ্যে একটি বিহ্বল মুহূর্তে সুচেতা সৌরেশের কোলে মাথা রেখে বলল, "এই মুহূর্তে পৃথিবী আমার কাছে স্বর্গ হত, শুধু যদি তুমি—"

"যদি আমি কি?" সৌরেশ ওর মাথায় একটা হাত রেখে পরম মমতার সুরে বলে, "কি আমি যদি?"

"যদি তুমি—যদি তুমি—যদি তুমি ওইটা না খেতে।"

"হা বিধাতা!" সৌরেশ হতাশার সুরে বলে, "এত তুচ্ছ একটা প্রতিপক্ষকে নিয়ে তোমার স্বর্গচ্যুতির যন্ত্রণা?"

"তুচ্ছ! বেশ না হয় তাই।" সুচেতা আবেগ-উত্তেজিত স্বরে বলে, "কিন্তু তুচ্ছই যদি তো আমার এত যন্ত্রণা দেখেও ছাড়তে পার না? সে ক্ষমতা নেই বলেই না—"

সৌরেশ হেসে উঠে বলে, "ক্ষমতা? এই মুহূর্ত থেকে চিরদিনের জন্যে ছেড়ে দিতে পারি।"

"পারো। সত্যি পারো?"

"তা পারি।"

"তবে আমায় কথা দাও—"

"না।" সহসা গম্ভীর হয়ে যায় সৌরেশ, "কথা দিতে পারি না।"

হঠাৎ যেন বাতাসের ঝটকায় প্রদীপ নিভে গেল।

"পারো না?"

"না! তোমারই বা কেন থাকবে এরকম অকারণ যন্ত্রণাভোগের দুর্বলতা?"

"অকারণ?"

"আমার মতে অকারণ।"

"তোমার মতটাই সব নয়।"

"আমার কাছে অন্ততঃ সব।"

"তোমার মতবাদকে খুব একটা বাহাদুরি মনে কর তুমি, কেমন?"

"মোটেই না। বাহাদুরির কি লজ্জার, নিন্দের কি প্রশংসার, কিছুই মনে করি না। আসলে কিছু মনে করবার মতই নয় ব্যাপারটা। তুমি কফি খেতে ভালবাসো, আমি না হয় মদ খেতে ভালবাসি, তফাৎ কোথা?"

কেটে গেছে সুর, ছিঁড়ে গেছে তার, থেমে গেছে গান। স্বামীর কোল থেকে যে কখন মাথাটা তুলে নিয়েছে সুচেতা, নিজেরই

খেয়াল নেই। এখন দেখা গেল উঠে দাঁড়িয়ে তীব্রস্বরে বলছে, "তফাৎ কোথায় জানো না? যখন নেশা কর তখন কি টের পাও কি কদর্য, কী কুৎসিত লাগে তোমায়!"

সৌরেশও দাঁড়িয়ে উঠেছে।

ঠোঁটের কোণটা ওর একটু বাঁকা হয়ে গেছে একটুকরো ব্যঙ্গহাসির আভাসে।

গাড়ির চাবিটা আঙুলে পেঁচিয়ে ঘোরাতে ঘোরাতে সৌরেশ বলে, "তা হয়তো টের পাই না, স্বীকার করছি। কিন্তু ওর জন্যে শুধু মদ বেচারাকেই বা দোষ দিচ্ছ কেন? আরো কত কারণেই যে মানুষকে কত কদর্য, কত কুৎসিত দেখায়, সেটা কি সে নিজে টের পায়? মানুষ যখন স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টায় যতদূর না ততদূর নোংরামি করে বেড়ায়, যখন প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থবৃদ্ধির লালসায় পাগল হয়ে ঘোরে, তখন তাকে কী উৎকট দেখায়, সে কথা সে নিজে বোঝে?"

"বাঃ চমৎকার!" সুচেতা বলে ওঠে, "নিজের অসভ্যতাকে সমর্থন করতে অনেক যুক্তি মজুত রেখেছ তো? তবুও তুমি ব্রীফ্‌লেস? তোমার যুক্তির জোরে তুমি তো খুনী আসামীকে বেকসুর খালাস করিয়ে আনতে পারো?"

"পাগল হয়েছ? আইন পড়াটাই আমার ভুল হয়েছে। আমার পক্ষে ওটা হচ্ছে স্রেফ অনধিকারচর্চা। খুনী আসামীকে বেকসুর খালাস করিয়ে আনার মত মহতী কর্মের জন্যে আছেন তোমার ভাইরা, আর আমার ভায়রাভাই। ও সব ওঁদেরই মানায়। নাও চলো, ফেরা যাক। চাঁদ ডুবে গেছে, মাঠ জঙ্গল আর নিরাপদ নয়।"

হঠাৎ সুচেতা বলে বসে, "আমি যাবো না তোমার গাড়িতে। ফিরবো না তোমার বাড়িতে।"

সৌরেশ মৃদু হেসে বলে, "আর কারো সঙ্গে কোন রকম বন্দোবস্ত করা আছে বুঝি? ঠিক আছে। তাহলে গুড বাই।" অদূরে গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল সৌরেশ।

ওমা ওমা! দিব্যি স্টার্ট দিয়ে গাড়িতে উঠে বসল যে! কী সর্বনেশে লোক! সুচেতা চারিদিকে চেয়ে দেখল মনুষ্যবসতির চিহ্নমাত্র কোথাও নেই, রাত্রি আটটাতেই মধ্যরাত্রির নিস্তব্ধতা।

হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে গেল সুচেতা। সবেগে দরজাটা খুলে গাড়িতে উঠে বসে ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলল, "তুমি কী! তুমি কী!"

এই প্রশ্ন শত শতবার করেছে সুচেতা সৌরেশকে, করেছে বিধাতাকে।

তুমি কী! তুমি কী!

বিধাতাকেও বলবে বৈ কি!

সত্যিই তো বিধাতা কী?

যার জন্যে সুচেতাকে জীবনের ভোজে সমস্ত স্বাদু উপকরণ দিয়েও সমস্ত বিস্বাদ করে দিয়েছেন, সেটাকে লবণাক্ত করে দিয়ে।

সৌরেশের মত এমন স্বামী কটা মেয়ের হয়?

কী সুন্দর সুকুমার চেহারা! কী সভ্য মার্জিত আচার-আচরণ, কত মমতা তার প্রাণে, কত ভালবাসা, কিন্তু সে সমস্তই অর্থহীন হয়ে গেছে সুচেতার জীবনে। শুধুই কি নিজের মানসিক জ্বালা? লোকলজ্জা নেই? সেটাই যে বেশী যন্ত্রণাকর।

প্রথম প্রথম লোকের কাছে লুকোতে চেষ্টা করত, দাঁতে দাঁত চেপে হেসে উড়িয়ে দেবার ভান করত, কিন্তু ভান বরাবর বজায় রাখা চলে না। কোন এক দুর্বল মুহূর্তে প্রকাশ পেয়ে যায়, প্রকাশ পেয়ে যায় চেপে রাখাটা যখন অসম্ভবের কোঠায় পড়ে। প্রথম ধরা পড়ল সুজাতার কাছে।

সুজাতা বাড়ি বয়ে এসে ছিছিক্কার করে গেল। বলল, এইবেলা যদি শক্ত হাতে রাশ টানতে না পারে সুচেতা, তাহলে সর্বনাশ ঘটবে। সর্বনাশ ঘটবে। সর্বস্বান্ত হতে হবে সুচেতাকে।

ক্ষেপে গেল সুচেতা। 'শক্ত হাতে রাশ টানবার' চেষ্টায় কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হয়ে উঠল। এতে সায় ছিল তার দিদি-দাদাদের।

সুজাতার সঙ্গে কারোরই মতদ্বৈধ নেই। শুধু সুচেতার মেজবৌদি, কি জানি কেন, তিনি বরাবরই যেন অসমর্থন করে গেছেন এটা। মুখের কথায় না হোক, চোখের ভাষায়। কোথায় যেন একটু প্রশ্রয় আছে সৌরেশের তাঁর কাছে।

কিন্তু তাতে আর কি? সুচেতাকে তো বাঁচতে হবে?

প্রথমে সুচেতা চেষ্টা করেছিল সৌরেশকে টেনে তুলে তাকে বাঁচিয়ে নিজে বাঁচবে, সে চেষ্টা ভেসে গেছে নতুন নতুন ধাক্কায়।

শেষ চেষ্টা—তাকে ত্যাগ করে শুধু নিজেকে ভাসিয়ে নিয়ে বেঁচে ওঠা। সে চেষ্টা শেষ পর্যন্ত সফল হয়েছে। সুচেতা মিত্র আবার ফিরে এসেছে বসুপরিবারের বেষ্টনীতে।

স্মৃতির সমুদ্র থেকে আরও একটা দিন ছেঁকে তুলল সুচেতা। রাত্রে সেদিন আবারও সুচেতা দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল যেদিন সকালে বিরাট কথা কাটাকাটি হয়েছিল। সুচেতার বন্ধ দরজায় প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়েছিল সৌরেশ, আশপাশের সমস্ত ফ্ল্যাটের লোককে সচকিত করে। আর নিরুপায় হয়ে যখন সুচেতা দরজা খুলে দিয়েছিল তখন সুচেতার একক শয্যার সরু খাটখানার ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে জড়িত কণ্ঠে চিৎকার করেছিল সৌরেশ, "মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিচ্ছ মানে? দরজা বন্ধ করবার তুমি কে হে বালিকা? আমার বাড়ি, আমার ঘর, আমি যেখানে ইচ্ছে ঢুকব, যেখানে খুশি শোব।"

শুয়েই গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়েছিল সে। আর সুচেতা সমস্ত রাত ঘরের দেয়ালে আর জানালার গরাদেতে মাথা ঠুকে ঠুকে পরীক্ষা করতে চেয়েছিল ওরাই শক্ত, না সুচেতার মাথাটাই শক্ত। এবং শেষ পর্যন্ত বোধ করি মাথাটাই জয়লাভ করল দেখে ভোর হতেই একবস্ত্রে চলে এসেছিল ভাইদের কাছে।

আশ্চর্য! আশ্চর্য!

বললে হয়তো কেউ বিশ্বাসই করবে না কথাটা। খানিক পরে, ভাইদের এই দালানে ন'টা নাগাদ টেলিফোন বেজে উঠল, "সুচেতাকে একবারটি ডেকে দিন তো।"

যেন বলে কয়ে বাপের বাড়ি এসেছে সুচেতা, যেন হঠাৎ কী দরকার পড়েছে তার স্বামীর। হয়তো বলবে চাবিটা কোথায় রেখে গেছ? হয়তো বলবে কখন ফিরবে?

সুচেতার এ রকম ভোরবেলা চলে আসায় ব্যাপারটা আঁচ করতে কষ্ট হয় নি কারুর, তথাপি সুচেতা যখন বলেছে,—"রাত্রে একটা বিশ্রী স্বপ্ন দেখে মনটা খারাপ হয়ে গেল, তাই চলে এলাম"—তখন সেটাই অন্তত দৃশ্যতঃ মেনে নিয়ে ওরা হাসি-গল্পের সঙ্গে চা-পর্ব চালাচ্ছিল। হঠাৎ এই টেলিফোন।

সুচেতার সেজবৌদি ধরেছিলেন ফোন। এসে মুচকি হেসে বললেন, "সুচেতা, দুঃস্বপ্ন দেখে এমন ব্যস্ত হয়ে ছুটে এসেছো যে, বাড়ির কর্তার ঘুম ভাঙা পর্যন্তও অপেক্ষা কর নি?"

সুচেতা চমকে বলল, "কেন?"

"ওই যে ফোনে ডাকাডাকি করছেন ভদ্রলোক।"

"ডাকাডাকি করছে! আমাকে?"

"না তো কি আমাকে?" সেজবৌদি হেসে উঠলেন।

"কি বলতে চায় শুনে নিলে না কেন বাপু! আমি আর উঠতে পারবো না।" বলল সুচেতা সহজ সুরে। উঃ কী কঠিন সেই সহজ হওয়া!

কিন্তু সেজবৌদির আগে উঠলেন মেজবৌদি। আর পাশের ঘর থেকে তাঁর কণ্ঠস্বর ভেসে আসতে লাগল সৌরেশের ধৃষ্টতার সংবাদ বহন করে করে।

"কি বললে? হীটার খারাপ হয়ে গেছে? চা খেতে পাও নি? ...এখানে চলে আসছো?...না, আমাদের চা-পর্ব এখনো শেষ হয়ে যায় নি, ও তো বেলা দশটা অবধি চলে। এস চলে, অবিলম্বে অবাধে।

…সুচেতা ? সুচেতা ওঘরে আড্ডায় ব্যস্ত, আমায় পাঠিয়ে দিল। একেবারে স্নান সেরে বাইরের পোশাকেই আসছ ? এখানে একেবারে চা এবং ভাত দুইই খেয়ে—ওঃ নিশ্চয়, নিশ্চয় ! খুব আহ্লাদের কথা ! আচ্ছা …চলে এসো তাহলে। ছাড়লাম।"

"মেজদি বুঝি সৌরেশবাবুকে নেমন্তন্ন করলে ?"

অমায়িক মুখে প্রশ্ন করল সেজবৌ।

মেজবৌদি এক পলক তাকিয়ে সহজভাবে বললেন, "হ্যাঁ। সুচেতা চলে এসেছে, সেই তো চাকরটার হাতে পড়তে হবে বেচারাকে ?"

সেজবৌ আরও অমায়িক মুখে বলে, "তা টেলিফোনের নেমন্তন্ন নিলেন তো ?"

"কেন নেবে না ?" মেজবৌদি আরও সহজভাবে বলেন, "সৌরেশ কি জামাইগিরির কিছু করেছে কখনও ? সে বরং ঠাকুরজামাই হলে, না নিলেও না নিতে পারতেন।·যাই দেখি গে রান্নাঘরের অবস্থা কি।"

সেজবৌ অস্বস্তি ঢাকতে টিপে টিপে হাসতে থাকে, আর সুচেতা নিষ্ফল আক্রোশে জ্বলতে থাকে।

কী করবে সে ? কী করবে ? লোকটা এলে চেঁচিয়ে হাট বাধিয়ে একটা কেলেঙ্কারি করবে ?

না, সে সব কিছু করা সম্ভব হয় নি সেদিন। খানিক পরেই সৌরেশ এসেছিল লাফাতে লাফাতে টগবগ করতে করতে। সদ্য-কামানো মুখ, সদ্য-পাটভাঙা স্যুট, সদাহাস্যে জ্বল জ্বল আকৃতি। এসেই হৈ হৈ করে মেজবৌদিকে প্রশ্ন করল, আজ রান্নাঘরের তালিকা কি, সেজবৌদিকে বলল, শীগ্‌গির চায়ের ব্যবস্থা করুন, আর সুচেতাকে ডেকে ডেকে দিব্যি দরাজ গলায় বলতে লাগল, "আচ্ছা লোক তো তুমি ? হঠাৎ একদিন যদি বাপের বাড়ির আদর খেতে ইচ্ছেই হয়ে থাকে, আমাকে ঘুম ভাঙিয়ে একেবারে সঙ্গে করে নিয়ে আসবে তো ? হতভাগা আমি অনাদৃত হয়ে চাকরের হাতে পড়ে থাকব, আর তুমি আদর খাবে এটা

কি হিন্দু নারীর সংস্কৃতির বিরোধী নয়? নিজেই তাই চলে এলাম, পাছে তুমি স্বধর্মচ্যুত হও।”

কিছুতেই পারে নি সেদিন সুচেতা চেঁচিয়ে হাট বাধিয়ে বেহায়া লোকটাকে অপমান করে তাড়াতে। সারাদিন বাপের বাড়িতে থেকে রাত্রে আবার ছ'জনে ঘটার ভোজ খেয়ে মেজদার গাড়ি করে এসেছিল নিজের বাসায়। ফিরে এসেও কিছুতেই লজ্জা দিতে পারে নি সৌরেশকে। কথার চাবুক মেরে মেরেও না।

সৌরেশ অনায়াস মহিমায় হাসতে হাসতে বলেছে, “আচ্ছা এত যে প্রেস্টিজ প্রেস্টিজ করে মাথা ঘামাও, এতে তোমাদের প্রেস্টিজের হানি হয় না? এই দাম্পত্যজীবনের তুচ্ছ সংঘর্ষকে অন্যের চোখের লেন্সের সামনে মেলে ধরে বড় করে তোলা?”

সুচেতা স্থির স্বরে বলে, “তোমার সঙ্গে ‘তুচ্ছ’ আর ‘বৃহতের’ তর্ক তোলবার প্রবৃত্তি আমার আর নেই। শুধু প্রশ্ন করছি, দাম্পত্য জীবনটাই যদি ভেঙে পড়ে, তা'হলে লোকের চোখ থেকে নিজেকে বাঁচানো যাবে কি করে?”

“সে জীবনটা কি এতই পলকা সুচেতা?”

“আহাহা তাও তো বটে—” তিক্ত ব্যঙ্গে সৌরেশকে মাটির অধম করে দিতে চেষ্টা করে সুচেতা, “এ যে একেবারে জন্ম জন্মান্তরের সম্বন্ধ! শুধু এজন্মে কেন, আগামী জন্মেও তুমি যদি গরু হয়ে জন্মাও, আমাকেও গো-জন্ম গ্রহণ করে এক খোঁটায় বাঁধা থাকতে হবে যে! ভুলেই গিয়েছিলাম।”

“ও রসিকতাটা বড্ড পুরনো হয়ে গেছে। আগের জন্মে যে সব কুলিন ব্রাহ্মণরা পঞ্চাশটা বিয়ে করেছে, এ জন্মে—মানে এ যুগে, সেই পরম সাধ্বী উনপঞ্চাশটি ধর্মপত্নীর কী দশা ঘটেছে, এ নিয়ে হাসি ঠাট্টাও একেবারে পচে গেছে সুচেতা!”

“এটা তো তোমারই প্রতিকূলে যাচ্ছে। তোমার জন্মান্তরবাদের প্রতিকূলে। ও কথা বরং আমি বলবো।”

"দু'জনে আমরা একই কথা বলবো সুচেতা! সেকথা হচ্ছে, দাম্পত্য জীবন কিছুতেই ভেঙে পড়ে না বিয়েটা যদি বৈধ হয়।

চমকে ওঠে সুচেতা, "যদি বৈধ হয় মানে? এ কথার অর্থ?"

"অর্থ তো খুবই সোজা সুচেতা! সব বিয়েই তো আর বৈধ হয় না!"

"তোমার সোজা কথাটা বুঝতে আমার একটু দেরী হচ্ছে। তোমার মতে তাহলে ওই চালকলাবাঁধা পুরুতের দেওয়া বিয়েটাই বৈধ বিয়ে, রেজিস্ট্রী করা বিয়েটা কিছুই না? অবৈধ?"

"না সুচেতা, আমার মতে বিধি-নির্দেশিত বিয়েটাই বৈধ।"

"ওঃ সেই ছেঁদো কথা! বিধাতা তোমার পকেটে পকেটে ঘোরেন, তুমি সর্বদা তাঁর অদৃশ্য হস্তের খেলা স্পষ্ট দেখতে পাও, সকলের তো তা নয়। আমরা বাস্তব জীব, মানুষ ছাড়া আর কাউকে দেখবার অলৌকিক ক্ষমতা আমাদের নেই, কাজেই মানুষের দেওয়া বিয়ে মানুষকে দিয়েই ভাঙবার চেষ্টা করবো।"

"ভাঙবার চেষ্টা করবে!" সৌরেশ অবাক হয়ে তাকাল, "কি ভাঙবার চেষ্টা করবে?"

"এটা আবার তোমার বুঝতে দেরী হচ্ছে দেখছি। 'বিবাহ বিচ্ছেদ' বলে একটা শব্দ আছে বাংলা ভাষায় জানো না বোধ হয়? 'চলন্তিকা' খুঁজে দেখে নিতে পারো।"

"ওঃ! বিবাহ-বিচ্ছেদ শব্দটা সনাতন বাংলাভাষায় ছিল না, তবে আধুনিক অভিধানে নিশ্চয় পাবো। কিন্তু তোমার পক্ষে এটা কি রকম হবে?" হঠাৎ নিজের ধরনে হেসে ওঠে সৌরেশ, "দেহাতি বেহারী মেয়েরা যেমন স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া হলেই হাতের চুড়ি ভাঙতে বসে, ঠিক তেমনি দেখাবে না?"

"অসহ্য!" বলে উঠে গেল সুচেতা।

কী ভেবেছে কী সৌরেশ? নিজের সমস্ত অন্যায়, সমস্ত অনাচার শুধু কথার জালে ঢেকে রেখে, অবিরত সুচেতাকেই 'খেলো' প্রতিপন্ন করে ছাড়বে?

সত্যই অসহ্য হয়ে উঠেছে, নাঃ আর সহ্য করা যায় না।

একবারের জন্যও যদি নতি স্বীকার করতো সৌরেশ, যদি স্বীকার করতো "কি করবো, কুশিক্ষা কুপরিবেশের ফলে গড়ে-ওঠা কুৎসিত এই বদভ্যাসটা ইচ্ছে সত্ত্বেও ছাড়বার ক্ষমতা আমার নেই, আমি নেশার ক্রীতদাস—" তা হলেও বোধ করি একবারের জন্যেও ক্ষমাভাব মনে আসতো !

কিন্তু এ কী লজ্জা ! এ কী অপমান !

যে কোন মুহূর্তে ছেড়ে দেবার ক্ষমতা নাকি আছে তার,তবু ইচ্ছে করেই ছাড়বে না। ছাড়বে না যতক্ষণ না সুচেতা—

কিন্তু সুচেতাও এবার পণ করেছে, বরং সৌরেশের ঘর ছাড়বে তবু তার কাঠিন্য ছাড়বে না। অন্যায়ের সঙ্গে আপস করে চলবার স্বীকৃতি দিয়ে নিজেকে খাটো করবে না। কিন্তু যাবে কোথায় ? দিদির বাড়ি, আর নয়তো দাদাদের বাড়ি। এ ছাড়া কোথায় কি আছে ? অথচ সে মুখো হতে ইচ্ছে করে না, কাউকে মুখ দেখাতেও ইচ্ছে করে না।

নেহাৎ আজ ভয়ানক যন্ত্রণায় দিশেহারা লাগছিল বলেই—

কিন্তু সেই যন্ত্রণাকে চাপা দিয়ে 'সহজ' সাজবার যন্ত্রণার মত যন্ত্রণা বুঝি আর নেই।

দিদির বাড়িতে লোক কম, সেখানে দু'দণ্ড নিজেকে নিয়ে নিজে থাকা সম্ভব হতে পারতো, কিন্তু সেখানে বিপদ আরো বেশী। দিদি কিছুতেই সহজ হতে দেবে না, খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বিস্তৃত বিবরণ চাইবে।

সুচেতা তবে করবে কি ?

মেয়েদের জীবনে 'নিজের জায়গা' বলে কি কিছুই থাকবে না ? একান্ত নিরালা একেবারে স্বতন্ত্র হয়ে থাকবার মত জায়গা ?

ভেবে কূল পায় না সুচেতা। উপার্জনশীল মেয়েরা হয়তো আর্থিক দিক দিয়ে সুবিধে করতে পারে, কিন্তু সামাজিক দিক দিয়ে সুবিধে কোথায় ?

সুচেতার সমাজে মেয়েদের নিরালা জীবনটা এতই অস্বাভাবিক যে, সে চেষ্টা করতে গেলেই সমাজের দৃষ্টিবাণ সতত তীক্ষ্ণ স্পর্শ দেবে সেই নির্জন শান্তির উপর। সে দৃষ্টি অনবরত চোখ রাঙিয়ে রাঙিয়ে বলবে— 'এ অনিয়ম' 'এ অনিয়ম'! বলবে—'দেখ মেয়ে, তুমি যদি তোমার দেহখানাকে কারো হেফাজতে না রাখো, আমি নিশ্চিন্ত হয়ে একটু ঘুমোই কি করে?'

কী ভয়ানক কড়া সম্রাট এই সমাজ!

এর ভয়েই তো শেষ পর্যন্ত সুচেতাকে আশ্রয় নিতে হল এই দাদাদের বাড়িতেই।

দাদাদের বাড়ি বৈকি!

একদা এ বাড়িটা যে একান্তভাবে সুচেতারও ছিল, এই বাড়িরই কোন একখানা ঘরে ভূমিষ্ঠ হয়েছে সুচেতা, এখানের মাটিতেই তার শৈশব কৈশোরের সমস্ত লীলারূপ বিকশিত হতে হতে একদিন যৌবনের পূর্ণ পরিণতি নিয়ে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে, একথা কি এখন আর কারো মনে আছে? কই, কারো মনে আছে এমন প্রমাণ কোথা?

এখানে কি সুচেতার জন্যে নির্দিষ্ট কোন খাঁজ আছে? যে খাঁজে ফের নিজেকে বসিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবে সুচেতা?

না, তেমন কোন খাঁজ খুঁজে পাচ্ছে না সুচেতা, সময়ের ঘসায় তার পুরনো খাঁজ কখন লুপ্ত হয়ে গেছে। নতুন খাঁজ কেটে নিতে পারবে এমন আলগা মাটিও কোথাও নেই। এখন এ বাড়ির সমস্ত মাটিতে মাটিতে, প্রত্যেকটি ধুলিকণায়, সুচেতার কিশোরী ভ্রাতুষ্পুত্রী অনিতার গর্বিত পদক্ষেপের স্বাক্ষর!

ওর ওই গর্বিত ভঙ্গী দেখলে কৌতুক লাগে সুচেতার। মনে হয় ডেকে দেখায় 'দেওয়ালে কি লেখা আছে পড়ে দেখ্ অনিতা! পড়তে শেখ্ দেওয়াল লিপি!' বলতে ইচ্ছে করে—'তোমার জন্য এই যে তোমার অভিভাবকদের স্নেহ-সমুদ্র সর্বদাই উত্তাল হয়ে আছে, সে সমুদ্র ততদিনই উত্তাল থাকবে যতদিন তুমি ওদের খেলার খেলনা, হাতের পুতুল থাকবে।

কিন্তু যে মুহূর্তে তুমি পুতুলের খোলস ছেড়ে মানুষের সত্তা নিয়ে জেগে উঠবে, সেই মুহূর্তে শুকিয়ে যাবে সেই অগাধ সমুদ্র। যদি তুমি তোমার অভিভাবকদের নির্বাচিত পাত্রের অপেক্ষায় তোমার চিত্তবৃত্তির দরজায় কপাট লাগিয়ে শবরীর প্রতীক্ষা করতে পারো, তা'হলে হয়তো বা তোমার ওপর তাঁদের এই শৌখিন স্নেহ আদরের কিছুটা বজায় থাকবে, কিন্তু যদি তার ব্যতিক্রম ঘটে, যদি তুমি তোমার মনের একটি কপাট খুলে দাও, যদি তুমি সেই খোলা দরজা দিয়ে প্রেমকে জীবনে আসতে দাও, তাহলেই গেলে তুমি! গেল তোমার আদর! তখন তোমার প্রাপ্য হবে শুধু লাঞ্ছনা আর গঞ্জনা, তিরস্কার আর টিট্‌কিরি। তোমার হৃদয়ে হৃদয়বৃত্তির সব কিছুকে বিকশিত হতে দেবে—স্নেহ মমতা, দয়া মায়া, শ্রদ্ধা ভক্তি, সব কিছু। কিন্তু খবরদার! প্রেম নয়! তুমি প্রেমে পড়লে, সেটা হবে তোমার অভিভাবকদের অপমান করা! সেই অপমান বোধের জ্বালায় শুরু করবেন লাঞ্ছনা!'

সুচেতার জীবনের সেই লাঞ্ছনা গঞ্জনার কালটা খণ্ড খণ্ড হয়ে চোখে ভাসতে থাকে সুচেতার সামনে। বড়দা গম্ভীর, মেজদা বিরক্ত, সেজদা কটুক্তিতে তৎপর, আর ছোড়দার আপ্রাণ সাধনা কি করে ওদের বিয়েটা পণ্ড করবে! তাছাড়া দিদির তীব্র উপদেশ বাণী আর সেজ-বৌদির প্রখর ব্যঙ্গ তো ছিলই। ভয়াবহ ভাবেই ছিল।

তবু সুচেতা টলে নি: তবু সুচেতা তার প্রেমকেই প্রাধান্য দিয়েছে।

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ যেন চমকে ওঠে সুচেতা, চমকে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে।

প্রেম? তাকে কি প্রেম বলে নাকি? সুচেতা যাকে 'প্রেম' বলে পুলকিত হয়েছিল আসলে সেটা সত্যি কি?

না, না কখনো সেটা সত্যকার প্রেম নয়। প্রেম হলে কি আজ—?

সুচেতা আলো ভেবে আগুনে ঝাঁপ দিয়েছিল, সেই আগুনে ঝলসে গেল সুচেতার সেই আনন্দময় কুমারী জীবন! এখন শুধু জ্বালা আর জ্বালা!

আগুন থেকে মুক্তি হয়েছে, কিন্তু জ্বালা থেকে মুক্তি হল কই ?

শেষ সেই দিনটা মনে করলে এখনো যেন দেহ মন দুই হু হু করে জ্বলে ওঠে সুচেতার।

দিন নয় রাত্রি !

যে রাত্রে রক্তাক্ত কপাল আর রক্তাক্ত ভাগ্য নিয়ে চিরদিনের মত ফিরে এল সুচেতা পতিগৃহ থেকে পিতৃগৃহে। কিন্তু দোষ কি সুচেতার ?

সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল, আর অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়ছিল। সৌরেশের আসার সময় বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার অভ্যাসটা অনেকদিন থেকেই ত্যাগ করেছিল সুচেতা, আর সেদিন তো দাঁড়াবার উপায়ও ছিল না। তবু সৌরেশের বাড়ি ফিরতে দেরী হলে অস্থির হয়ে ওঠবার অভ্যাসটা যায় নি। তাই উত্তরোত্তর অস্থির হচ্ছিল সুচেতা।

বৃষ্টির বেগ যত বাড়ছিল, সুচেতার চাঞ্চল্যও তত বাড়ছিল। অসহিষ্ণু হয়ে উঠছিল মন।

এমন একটা অসহিষ্ণু মুহূর্তে সৌরেশ এসে বাড়ি ঢুকল, একটি পূর্ণ বোতল হাতে করে। বেশ স্বচ্ছন্দচিত্তে সেটাকে টেবিলে বসিয়ে রেখে খোলা গলায় বলল সৌরেশ, "আজ বাড়ি বসেই পান করবো ঠিক করছি। তোমারও ভয় ভাঙবে, আমারও সময় বাঁচবে। এই বারি ঝরে ঝরঝর রাতে—"

এ যাবৎ সৌরেশের ব্যবহারে অনেকবার স্তম্ভিত হয়েছে সুচেতা, অনেকবার পাথরের পুতুলের ভূমিকা নিয়েছে, কিন্তু তবু এতটার জন্যে প্রস্তুত ছিল না।

তাই সৌরেশের কথা শেষ হবার আগেই হঠাৎ উন্মাদের মত একটা কাজ করে বসল সুচেতা। অর্থহীন অস্ফুট একটা চীৎকার করেই সেই ভারী বোতলটা টেবিল থেকে তুলে নিয়ে 'ঠাঁই' করে বসিয়ে দিল নিজের কপালে। তীব্র একটা গন্ধে ভরে উঠল ঘর, আর রক্তের ধারা গড়িয়ে পড়ল সুচেতার কপাল বেয়ে।

পরে অবশ্য, (কুণ্ঠিত সঙ্কোচে স্মরণ করল সুচেতা) মামলার জোর হ'বার প্রয়োজনে সুচেতাকে আদালতে দাঁড়িয়ে বলতে হয়েছে 'বোতলটা সৌরেশের হাতেই ছিল, আর আঘাতটা কি ভাবে এসেছিল তার ঠিক চেতনা নেই, কারণ রাগে অন্ধ ছিল সে তখন।' অতএব? অতএব তার পক্ষের উকিল কার্যকারণ সম্পর্ক আবিষ্কার করে স্বচ্ছন্দেই বলেছিলেন আঘাতটা সৌরেশের দ্বারাই সংঘটিত। আর প্রশ্ন এই, যে স্বামী জ্ঞানশূন্য মাতাল হয়ে এ রকম নৃশংসতা করতে পারে, তার হাত থেকে সেই উৎপীড়িতা স্ত্রীকে মুক্তি দেবার বিষয় এতটা দ্বিধা করবার হেতু কি ধর্মাবতারের?

এরপর আর দ্বিধা করেন নি ধর্মাবতার।

কিন্তু সুচেতা নিজে তো ভালই জানে, জ্ঞানশূন্য মাতাল সেদিন হয় নি সৌরেশ, কোনদিনই হতো না।

তবু সুচেতা রাগে অন্ধ হয়েছিল সত্যিই। আর নিজের কপাল রক্তাক্ত করেছিল নিজেই। বিদ্যুৎবেগেই করেছিল, সৌরেশ বাধা দেবার অবকাশ পায় নি।

সেই আঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই সৌরেশ চীৎকার করে লাফিয়ে উঠল টেবিল উল্টে চেয়ার ফেলে। সুচেতাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে আর্তনাদ করে উঠল, "কি করলে সুচেতা? কী সর্বনাশ করলে? এ যে সব মিথ্যে, সব বাজে!"

কিন্তু সুচেতা এক ঝটকায় ছাড়িয়ে নিল নিজেকে। "হাত দিও না আমার গায়ে—" বলে কপালে শাড়ির আঁচলটা চেপে ছুটে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল সিঁড়ি থেকে পথে।

সৌরেশও পিছু পিছু নেমে এল, ব্যাকুল ভাবে বলল, "শোন সুচেতা শোন, সত্যি কথাটা শুনে যাও—"

কিন্তু সুচেতার পক্ষে তখন সম্ভব নয়, ফিরে দাঁড়িয়ে সৌরেশের 'বানানো সত্যি কথা' শোনা। তাই তীব্রকণ্ঠে জানিয়ে দিল, সৌরেশের কোন কথাই আর শুনতে চায় না সে। যবনিকা পড়ে যাক

তাদের দাম্পত্য জীবনে। আর সে জীবনের জের টানতে সৌরেশ যদি এখন সুচেতার পিছু নেয়, পথে দাঁড়িয়ে চীৎকার করবে সুচেতা, রাস্তার লোককে ডেকে বলবে—এই লোকটাকে চেনে না সুচেতা, বৃষ্টির নির্জনতার সুযোগে বদমতলবী লোকটা সুচেতার পিছু নিয়েছে। রাস্তার লোক তখন কী ব্যবস্থা করবে, সৌরেশ অবশ্যই আন্দাজ করতে পারছে!

সৌরেশ ভেবে দেখুক তাই চায় কিনা!

এর পরই স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল সৌরেশ। দাঁড়িয়ে পড়েছিল সিঁড়ির মাঝখানে।

প্রচণ্ড বৃষ্টির দরুণ আশপাশের ফ্ল্যাটগুলো বন্ধ ছিল, আর বৃষ্টির শব্দে চাপা পড়ে গিয়েছিল ওদের কথার শব্দ, তাই নিরঙ্কুশ বেরিয়ে গেল সুচেতা সেই মুষলধারা বৃষ্টি মাথায় করে। পথে যান-বাহনের চিহ্নমাত্র নেই।

বৃষ্টির জল তো বটেই, তাছাড়া রাতও কম হয় নি তো? কিন্তু পাগলের পক্ষে সবই সম্ভব। সুচেতাও সে মুহূর্তে পাগলই হয়ে ছিল বৈকি! নইলে সেই বৃষ্টি মাথায় করে পায়ে হেঁটে চলে আসতে পারে সুচেতার মত আরাম আর আদরে-লালিত একটা তরুণী মেয়ে থিয়েটার রোড থেকে কাঁকুলিয়া রোডে।

এ বাড়িতে তখন চাবি পড়ে গিয়েছিল, শুধু মুহুর্মুহুঃ কলিংবেলের তীব্র আওয়াজে বিরক্ত হয়েই বোধ করি, মেজদা নিজেই এসেছিলেন দরজা খুলে দিতে।

তারপর "কি ব্যাপার কী!" বলে চীৎকার করে উঠেই মেজদা তাঁর গাড়ি বার করতে যাচ্ছিলেন—রাস্কেলটাকে গুলি করে আসবেন বলে। সুচেতা হাত নেড়ে থামালো, বললো, "সম্পর্ক সব শেষ করে দিয়ে এলাম। আর কেন?"

'সব সম্পর্ক শেষ করে?' মেজদা থেমে পড়লেন।

চাকর-বাকর পাছে কেলেঙ্কারী টের পায় বলে মেজদা হঠাৎ সেই প্রচণ্ড ক্রোধ গিলে ফেলে নিঃশব্দে সুচেতাকে দোতলায় নিয়ে গেলেন,

দিলেন 'ফার্স্ট এড'। আর মেজবৌদিকে দিতে বললেন শুকনো শাড়ি ব্লাউজ।

বললেন, "বোস শুনছি সব। দেখিয়ে দেব সেই রাস্কেলটাকে, কি করে শিক্ষা দিয়ে দিতে হয়।"

তারপরই ঘটল কেলেঙ্কারীর চরম!

খানিক পরেই উদভ্রান্তের মত ছুটে এল সৌরেশ। পায়ে হেঁটে না হলেও ভিজে টিজে একাকার হয়ে রিক্‌শ চড়ে।

কী নির্লজ্জতাই করেছিল সেদিন সৌরেশ! এখনো মনে করলে সুচেতার মাথাটা কাটা যায় ঘৃণায় লজ্জায়।

শোকাচ্ছন্নের মত অদ্ভুত একটা বিষণ্ণতার ভান করে সৌরেশ বলেছিল কিনা, সবটাই না কি ঠাট্টা! সুচেতাকে রাগাবার জন্যে! সুচেতা রাগে দিশেহারা হয়ে রজ্জুতে সর্পভ্রম করেছে। আসলে ওটা কিছুই নয়। সুচেতার জন্যেই আনা একটা নামকরা টনিক! কিছুদিন থেকে বড্ড বেশী রোগা হয়ে যাচ্ছিল সুচেতা, তাই ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে—

কী নির্লজ্জতা!

এই নির্বোধ নির্লজ্জ মিথ্যা কথা কেউ বিশ্বাস করতে পারে? কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি?

এত ভাল করে গুছিয়ে বলতে অবশ্য পারে নি সৌরেশ, বলেছিল ছাড়া ছাড়া ভাবে প্রায় জোর করেই। সেটুকুও মেজবৌদির দয়াতেই সম্ভব হয়েছিল। নইলে ততক্ষণে ঘুম ভেঙে উঠেছিলেন অন্য দাদারাও, আর শেষ পর্যন্ত সৌরেশকে প্রায় ঘাড় ধরে বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছিলেন তাঁরা সেই বৃষ্টির মধ্যেই।

ভাবতে ভাবতে চিন্তার ধারা চলে যায় অন্য পথে।

'কিছুদিন থেকে বড্ড বেশী রোগা' হয়ে যাচ্ছিল সুচেতা সত্যিই। অকারণেও নয়। শুধু ঠিক সেই সময়টাতেই সুচেতার ভয়ঙ্কর মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে কাটছিল বলে কারণটা সকলেরই অজ্ঞাত থেকে গিয়েছিল।

এমন কি সৌরেশরও। সৌরেশও ভেবেছিল শুধু এমনই রোগা হয়ে যাচ্ছে সুচেতা।

ঈশ্বর রক্ষা করেছেন!

মানসিক বিপর্যয়ে গোলমালে সেই বিরাট সম্ভাবনার সূচনাটুকু বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে সুচেতার দেহ থেকে! নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে সৌরেশ মিত্তিরের সত্তার স্ফুলিঙ্গকণা!

ঈশ্বর রক্ষা করেছেন! ঈশ্বর রক্ষা করেছেন! এ সুচেতার জপ মন্ত্র! নইলে আরও কত জটিলতার জালে বন্দী হতো সুচেতা!

এখন সুচেতা মুক্ত। ভয়ঙ্কর ভাবে মুক্ত।

কিন্তু তাহলে? তাহলে এবার কি?

সত্যিই তো কী এবার? সকলেই ভাবছে সে কথা। কী এবার?

উপার্জন? স্বাবলম্বন? পুনর্বার জীবনসঙ্গী নির্বাচন? না, এমনি অলস মৃদুছন্দে কুমারী কন্যার পদ্ধতিতে জীবন-যাপন?

সকলের অনুক্ত প্রশ্নের উত্তর দিল সুচেতা নিজে থেকেই। "এবারে একটা কিছু ভাবো মেজদা!"

"ভাববো? কি ভাববো?"

মেজদা বুঝেও না বোঝার ভান করেন।

"যা হোক কিছু একটা করতে তো আমাকে হবে!" অল্প হেসে বলে সুচেতা, "বরাবর তোমাদের স্কন্ধে ভর করে বসে থাকাটা তো যুক্তি সঙ্গত নয়!"

"আমাদের কাঁধটা এত কমজোরই বা ভাবছিস কেন?" মেজদা গম্ভীর ভাবে বলেন, "তাড়াহুড়ো করে কোন কিছু করবার দরকার নেই।"

মেজদা উঠে যেতেই সেজবৌদি বলে ওঠেন, "তুমি কি তাহলে স্বাবলম্বনই ঠিক করলে নাকি সুচেতা?"

"একটা কিছু তো ঠিক করতেই হবে?"

সেজবৌদি মৃত্থ হেসে বলেন, "তা এবার দেখেশুনে সত্যিকার ভাল একটি বর ঠিক করাই উচিত। এবার আর নিজে না দেখে, আমাদের হাতেই ছেড়ে দাও বরং।"

কান মাথা গরম হয়ে উঠলেও মুখে হাসি বজায় রাখতে হয়, নইলে মান থাকে না। মুখে হাসি টেনে এনে সুচেতা বলে, "ন্যাড়া কবার বেলতলায় যায়?"

এরপর আসবেন দিদি। নিশ্চিত আসবেন জানা। তিনি এসেই চুপি চুপি শুরু করবেন, "এতই বা ভাবনা কি? শুধুই তো আর ডাইভোর্স আইন হয় নি, মেয়েদের আরো অনেক সুবিধেই হয়েছে। বাপের সম্পত্তিতে মেয়েদের ভাগ আছে এখন, তাতো জানিস? আর এও জানিস, এই সব ঘর বাড়ি টাকাকড়ি সবই বাবার করে যাওয়া।"

গতকালও এ কথা হয়ে গেছে।

আজও হল ঠিকই।

সুচেতা মৃত্থ হেসে বলল, "এবার তাহলে আর একপালা মামলা ভাইদের সঙ্গে?"

"তা যদি স-মানে ভাগ না দেয় ওরা"—সুজাতা উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলে, "করতে হবে বৈকি! তোর ভগ্নিপতি তো বলছিলেন—ভগবানের দয়ায় আমাদের তো কিছু অভাব নেই, আমরা গ্রাহ্যও করি না ওটুকু। সবটাই ছোটশালী নিক। তোমাদের দুইবোনের ভাগ যদি একা ও পায়, তাহলে ওর জীবনে অন্ততঃ ভাত কাপড়ের অভাব হবে না।"

অর্থাৎ তিনি যখন ভগবানের দয়া লাভ করেছেন, তখন মানুষকে দয়া করবার দাবি তাঁর অবশ্যই জন্মেছে। কাজেই যে সম্পত্তিটুকু তিনি গ্রাহ্য করেন না, সেটুকু দান করতে পিছপা হবেন না।

সুচেতা কিন্তু এতখানি উদারতার মান রাখল না, এক ঝলক তিক্ত হাসি হেসে বলল, "ভাত কাপড়ের অভাব না থাকলেই জীবনের সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল, কি বল?"

ছোট বোন হয়ে মুখের ওপর এ হাসি হাসলে জ্বলে উঠবেন না, এমন বরফগলা মেজাজ তা বলে সুজাতার নয়। তিক্তহাসি হাসতে তিনিও জানেন, ছোটর চাইতে বেশিই জানেন বরং। সেই হাসি হেসেই তিনি বলেন, "আমরা মুখ্যু হাবা সেকেলেরা তো তাইই বুঝি। তা তাতে সমাধান না হলে, সেজবৌয়ের পন্থা তো খোলাই আছে। তবে কপালে আবার কোন গুণের অবতার জুটবেন, তার কিছু তো গ্যারান্টি নেই! অবিশ্যি জুটলেই যথেষ্ঠ! বলে এযুগে টাটকা মেয়েগুলোরই বর জুটছে না, তিরিশ চল্লিশ হয়ে বসে থাকছে, তা আবার বিধবা কি বাসি। বিদ্যেসাগরের আইন এই একশো বছর ধরে অনড় হয়ে বসে আছে কি আর অমনি? নিরুপায়েই আছে।"

এরপর আর কোন কথা বলবে সুচেতা?

বলে না, চুপ করে উঠে যায়।

দিন যায় উদ্দেশ্যহীন, অর্থহীন, অদ্ভুত একটা অবস্থায়। আপাতদৃষ্টিতে হয়তো কুমারী কন্যার মতই লাগে, কিন্তু কুমারী কন্যার হৃদয় সুচেতার কোথায়? সংসারের কোন দায়িত্বের দায় নেই, দায় নেবার ইচ্ছেও নেই। একদিন যে এই মাটিতেই শিকড় ছিল সুচেতার, সে কথা যেন এই ক'টা বছরে সুচেতা নিজেও সম্পূর্ণ ভুলে গেছে। এখন ওর এ সংসারে যেন দর্শকের ভূমিকা।

শিকড় উৎপাটিত গাছকে ফিরে ফিরতি আবার সেই আলগা মাটিতে বসিয়ে দিতে চাইলেই কি সে বসে?

"চাকরি চাকরি" করে পাগল হয়েছিল, ক্রমশঃ জ্ঞানচক্ষু খুলল। ইন্টারমিডিয়েট ফেল বিদ্যে নিয়ে এ যুগের হাটে সভ্য ভদ্র কোন চাকরি পাওয়া সম্ভব নয়। দাদাদের মুখে আরও একবার চুনকালি মাখিয়ে কি কাপড়কাচা সাবানের অথবা দালদার ক্যানভাসিং করে বেড়াবে সুচেতা?

সেই কথাই স্মরণ করিয়ে দিলেন তিক্ত হাসি হেসে সেজদা, আর সেজবৌদির দাদা। বললেন, "এ বিদ্যেয় ওর চাইতে ভাল আর কিছু আশা করো না।"

সুচেতা মেজদার কাছে এসে বলল, "আমি আবার পড়ব।"

মেজদা গম্ভীর ভাবে বললেন, "বেশ! কালই মাস্টারের চেষ্টা করবো।"

"এখুনি মাস্টার কেন? আগে ভর্তি হই?"

মেজদা আরও গম্ভীর হয়ে বললেন, "ভর্তি? কোথায় ভর্তি হবে?"

"তুমি যেখানে বলবে।" সুচেতা মনে জোর এনে বলল, "আমাদের পুরনো কলেজেই না হয়—"

"পুরনো? মানে আশুতোষে? অসম্ভব! সীট পাওয়া অসম্ভব! আজকাল একটু কম নম্বর পাওয়া মেয়েই নিতে চায় না ওখানে, তো একবার ফেল করা"—থেমে গেলেন মেজদা।

সুচেতা গলাটা ঝেড়ে নিয়ে বলল, "বেশ অন্য যেখানে হোক। বিদ্যাসাগর, মুরলীধর, সিটি—"

কথা শেষ হবার আগেই সেকথা মূল্যহীন হয়ে গেল মেজদার হাসিতে। মেজদা গম্ভীর হাস্যে কথাটা নিতান্ত উড়িয়ে দিয়ে বললেন, "সেখানেই বা দিচ্ছে কে? কোথাও সীট পাবে না। যখন ফেল করেছিলে, তখন যদি মিথ্যে লজ্জায় 'আর কিছুতেই পড়ব না' বলে জেদ ধরে বসে না থাকতে"—আট বছর আগের সেই ঘটনা তুলে খোঁটা দেন মেজদা—"তাহলে আর এ অবস্থা ঘটত না। বি. এ-টা পাশ করা থাকলে অনেক সুবিধের আশা থাকে। তখন তো বলেছিলাম ঢের। এখন আর হয় না। এখন তো স্কুল-কলেজে একটা সীট পাওয়া প্রায় ভগবান পাওয়ার সামিল!"

বড়দার কাছে কথা তোলাই গেল না। তিনি বললেন, "আমাকে আর কোন কিছুতে জড়াতে এসো না। আমি কিছু পারব না। তবে এটুকু ভরসা দিতে পারি, আমি যদি খেতে পাই, তুমিও ছুটো পাবে।"

খাওয়া! খাওয়া! এর বাইরে আর কিছু ভাববার ক্ষমতা কারো নেই।

ছোড়দাকে পাওয়াই শক্ত। তবু সুচেতা তার শরণাপন্নও হল একবার, "আমার একটা কিছু ব্যবস্থা করে দাও না। কিছু না হোক, ছুটো ছোট ছেলে মেয়েই পড়াই না হয়। দাও না জুটিয়ে।"

ছোড়দা দস্তুরমত হো হো করে হেসে উঠল, "কেন, বাড়ির কর্তারা বুঝি ভাতের খরচে কুলিয়ে উঠতে পারছেন না আর ? না কি সেজগিন্নী তাক বুঝে কিছু খোঁটা দিয়ে নিয়েছেন ?"

"আঃ, কেন মিথ্যে চেঁচাচ্ছ ?" সুচেতা ঝেঁজে ওঠে, "ভাত ! ভাত ! ভাতটাই সব ? ওর উর্ধ্বে আর কিছু নেই ? দিন কাটানোর একটা উপায়ও তো চাই ? তাছাড়া—ভবিষ্যৎটাও ভাবা দরকার নয় কি ? আমার মত মুখ্যু মেয়ের পক্ষে যেটুকু সম্ভব—"

"ঠিক ! ঠিক !" ছোড়দা স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে চেঁচিয়ে ওঠে, "নিশ্চয় ! নিশ্চয় একটা কিছু করা দরকার। তা অত ভাবছিস কেন ? তুই তো ড্রাইভিং জানিস ?

"ড্রাইভিং ! মোটর ড্রাইভিং ?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ !" ছোড়দা সোল্লাসে বলে ওঠে, "একটা লাইসেন্স নিয়ে নে, নিয়ে একখানা ট্যাক্সি গাড়ি কিনে ফেল। তারপর আর ভাবনা কি ? নিজেই চাকর, নিজেই মালিক, কাউকে ভাগ দিতে হবে না, নৈবিদ্যি দিতে হবে না—"

"কী বকছ পাগলের মতন ?" প্রায় ধমকে ওঠে সুচেতা, "ট্যাক্সি নিয়ে কি করবো আমি ?"

"কেন চালাবি !" ছোড়দা হাতের সিগারেটটায় একটা মোক্ষম টান দিয়ে বলে, "বেশ নতুন কিছু হবে একটা। মেয়েরা তো আজকাল সব লাইনেই যাচ্ছে দেখছি, শুধু এটাই এখনো চোখে পড়ে নি। কই পড়েছে কি ? আচ্ছা ভাবি রোস—মহিলা ট্যাক্সি-চালিকা · মহিলা ট্যাক্সি-চালিকা···নাঃ, কোথাও দেখি নি। তুই দেখেছিস ?"

সুচেতা বিরক্ত ভাবে ঝেঁজে উঠে বলে, "না"।

"এই দেখ, রেগেই মরছে! আরে বাবা, কী একটা চমৎকার আইডিয়া দিলাম, আর তুই কিনা রেগে মরছিস? যা কেউ কখনো করে নি, সে কাজ করার মধ্যে মজা কত, বাহাদুরী কত! 'প্রথম মহিলা'র তালিকায় নাম থেকে যাবে তোর। আর বুঝতেই পারছিস"—জোরে হেসে উঠে ছোড়দা বলে, "মিটার না দেখেই ভাড়া দিয়ে ফেলবে লোকে।"

"গোল্লায় যাও তুমি!" বলল সুচেতা জোরে টেবিলে একটা কিল মেরে।

ছোড়দাও টেবিলে আর একটা জোরালো ঘুষি মেরে বলল, "আচ্ছা দেখে নেব। আজ এর জন্যে আমায় গোল্লায় পাঠাচ্ছিস, এরপর দেখিস ওই কাজই রসগোল্লার মত লুফে নেবে মেয়েরা। আজ যে কাজে লজ্জার বাধা, কাল সেই কাজে বাধা বোধ করাই লজ্জা, এই হচ্ছে সভ্যতার অগ্রগতি, বুঝলি? কালে ভবিষ্যতে হয়তো দেখবি ট্যাক্সি মেয়েরাই চালায়। পুরুষরা ছেড়ে দিয়েছে।"

"ওঃ, কী একেবারে ভবিষ্যৎবক্তা এলেন!"

"তা মাঝে মাঝে আমি যা ভবিষ্যৎবাণী করি, ফলে না? ফলে কিনা"—ছোড়দা চোখ কুঁচকে মুচকে হেসে বলে, "নিজেই ভেবে দেখ। এই যে—যখন মহামহিম শ্রীযুক্ত সৌরেশবাবুকে বিয়ে করবার জন্যে পাগল হয়েছিলি, বলি নি তখন, এরপর—"

"আচ্ছা থাক্, ঢের হয়েছে!" বলে ঠিকরে উঠে যায় সুচেতা।

আশ্চর্য! আশ্চর্য!

সুচেতার দুর্ভাগ্য, আর সুচেতার ভুল এ দুটো যেন এদের কৌতুকের খোরাক, আত্মমহিমা প্রচারের ক্ষেত্র!

তখন এরা বলেছিল, 'সাবধান!' সুচেতা শোনে নি সে সাবধান-বাণী, আর না শুনে পড়েছে দুঃখে, অতএব এদের আর আনন্দের অবধি নেই।

সুচেতা মরলো, তা মরুক, এদের ভবিষ্যৎবাণী তো ফললো!

এরই নাম আত্মীয়। এই নিয়ে মানুষের সংসারের কারবার। মা-বাপ, ছেলে-মেয়ে, স্বামী-স্ত্রী কেউ কাউকে রেয়াৎ করে না।

সুচেতা চলে গেলেও ছোড়দা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে নেয়, "আর একবার ভেবে দেখলে পারতিস! ভাল কথাই বলেছিলাম, একটা নতুন পথ বাৎলে দিচ্ছিলাম! এই বেকারের রাজ্যে করে খাবার আর কোথায় কি পথ আছে বাবা!"

ওই একটা কথা ঠিক বলেছে ছোড়দা। পথ নেই! পথ নেই! কোথাও কোনখানে পথ নেই! জগতের সমস্ত দরজা তোমার মুখের ওপর বন্ধ আছে। সেই বন্ধ দরজা খোলাতে অনেক সাধনা, অনেক ধৈর্য, অনেক কৌশল, আর অনেক সহায় আবশ্যক। সুচেতার সে সব কই?

অথচ অস্থির হয়ে জগতের রাস্তায় বেরিয়ে পড়বারও উপায় নেই সুচেতার। তার দাদারা স্নেহশীল, কর্তব্যপরায়ণ। তাঁরা ভাগ্য-তাড়িত ছোট বোনটিকে পরম স্নেহে আশ্রয় দিয়ে আশ্বাস দিচ্ছেন—কেন এত অস্থিরতা? এখানে কি তুই কষ্টে আছিস? বল কি কষ্ট? আমাদের সংসারে কি ভাতের অভাব, তাই তুই খেটে খাবি? আইবুড়ো বেলায় যেমন আদরে-যত্নে ছিলি, থাক না তাই। চিরকালই থাক। কেউ কোন অনাদর করবে না। দিন না কাটে, উল বোন, ছুঁচে রেশমের ফুল তোল, মন ফাঁকা ফাঁকা লাগে তো আমাদের ছেলেমেয়েগুলোকে কোলে পিঠে করে ভুলে থাক। আবার কি চাই?

তাই তো আবার কি চাই!

কথাটা সত্যি! একটা মেয়েমানুষের জীবনে আবার কি চাই?

এদেশে বিধবাদের দিন তো এই ভাবেই কেটে এসেছে চিরকাল। এত আদরই বা কে কবে পেয়েছে? এই আদর, এই স্নেহের মর্যাদা লঙ্ঘন করে সুচেতা কোন মুখে পথে পা বাড়াবে?

মনকে মানিয়ে নেবার চেষ্টা করে সুচেতা, কিন্তু কিছুতেই মানতে চায় না সে মন।

সর্বক্ষণ হাহাকার করতে থাকে। সমস্ত সংসারের আদরেও একটি মানুষের আদরের অভাব পূরণ হয় না, এত লোকের ভীড়েও নিজেকে নিতান্ত নিঃসঙ্গ মনে হয়। আর আজন্মের এই আশ্রয়কে কিছুতেই সত্যকার আশ্রয় বলে বোধ হয় না।

এই শহরেরই একান্তে অনেক বড় একটা বাড়ির অনেকগুলো খোপের মধ্যবর্তী একটি খোপ—তার দু'খানি ঘর, ছোট একটি বারান্দা, সামান্য কয়েকটি আসবাব, আর নিতান্ত শৌখিন পর্দা-ঝোলানো কটি জানলা-দরজার সম্বল নিয়ে অবিরাম যেন কী এক দুর্নিবার আকর্ষণে টানতে থাকে সুচেতাকে।

যখন মামলা চলছিল, তখন তো কই এমন হয় নি!

না হারালে বুঝি কোন বস্তুরই যথার্থ মূল্য বোঝা যায় না!

যার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যে মাথা কোটাকুটি, মুক্তি পেয়ে তারই জন্যে মন এক অলক্ষ্যলোকে বসে মাথা কুটে মরতে চায়, এ কী অদ্ভুত রহস্য!

সেজবৌ বলে, "যাই বলুন মেজদি, এটা কিন্তু আপনাদের ঠিক হলো না। শুধু বসিয়ে রাখবেন সুচেতাকে, নয়তো চাকরি করে খাবে সে, এই জন্যেই কি এত মামলা করে বিবাহ-বিচ্ছেদটা করালেন?"

মেজবৌদি শান্তদৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে বলেন, "আমি এসব করালাম এমন অদ্ভুত ধারণা তোমার হল কেন বল তো সেজবৌ?"

জা'-কে তিনি নাম ধরে ডাকেন না কখনো, সেজবৌই বলেন। প্রথম প্রথম সেজবৌ আপত্তি করেছিল, "বড্ড সেকেলে সেকেলে লাগে।" মেজবৌদি হেসে বলেছিলেন, "তা আমি তো বাপু সেকেলেই।" যদিও এটা বিনয়, সেজবৌয়ের চাইতে খুব জোর পাঁচ ছ'বছরের বড় তিনি। কিন্তু সেকথা যাক, সত্যিকার ছোট বড়োর হিসেব সব সময় বয়স দিয়ে নির্ণয় হয় না। সেজবৌ তীক্ষ্ণ হেসে বলল, "তা আপনিও যা, মেজদাও তাই। সত্যি বলতে, মেজদা উঠে পড়ে লেগে করলেন বলেই না—"

মেজবৌদি বললেন, "তা সত্যি! আমরা দু'জনে যে একই ওটা খেয়াল ছিল না আমার। কিন্তু তুমি সুচেতার কথা কি যেন বলছিলে!"

"বলছিলাম"—কথায় বেশ জোর দিয়ে সেজবৌ বলে, "ওর আবার বিয়ে দেওয়া উচিত! নইলে এই সব লড়ালড়ির কোন মানেই হয় না।"

"ও কি আর একবার বিয়ের ইচ্ছে প্রকাশ করেছে না কি?" সহজ সুরেই প্রশ্ন করেন মেজবৌদি।

"ইচ্ছে কি আর প্রকাশ করতে হয়? ভাল করে তাকিয়ে দেখলেই বোঝা যায়। দেখেন না কি রকম আড়-আড় ছাড়-ছাড় ভাবে থাকে? সর্বদাই যেন মন কোন আকাশে! যদি মনকে ঠিক করে নিত এখানেই এবার থেকে থাকতে হবে, তাহলে কি আর এ রকম করত?"

মেজবৌদি একই ভাবে বলেন, "কি জানি, আমি তো অত বুঝতে পারি না। লক্ষ্যও কম, সময়ও কম। সংসারের চাপে চাপে নিজের মনপ্রাণ তো ক্রমশঃই পাতালে তলিয়ে যাচ্ছে, কার মন আকাশে উড়ছে টেরও পাই না। তা ভাল পাত্র তোমার হাতে আছে বুঝি?"

শেষের প্রশ্নটা ভারি অমায়িক শোনায়, আর কেন কে জানে এই নিরীহ স্বরটাতেই সেজবৌয়ের মাথার রক্ত হঠাৎ চড়াৎ করে চড়ে ওঠে। বলে, "ভাল পাত্র কথাটার অর্থ আপনি কি বোঝেন?" তীক্ষ্ণস্বরে প্রায় চেঁচিয়েই ওঠে সেজবৌ।

"কী মুস্কিল! এর আর বোঝাবুঝির কি আছে?" মেজবৌদি বলেন, "অন্ততঃ সৌরেশের চাইতে সর্বাংশে ভাল হওয়া দরকার, এই তো বুঝি।"

"সর্বাংশে! সর্বাংশে কথাটার মানে আবার আমি বুঝি না মেজদি!" সেজবৌ হুল ফুটিয়ে বলে, "মাতাল নেশাখোর না হলেই চলবে।"

মেজবৌদি শান্তভাবে বলেন, "অসচ্চরিত্র হলে চলবে?"

"তার মানে?" জ্বলে ওঠে সেজবৌ।

"মানে আর কি"—মেজবৌদি বলেন, "তা না চললে তো, তেমন হলে আবারও আদালতে ছুটতে হবে।"

সেজবৌ রাগে ছটফটিয়ে বলে ওঠে, "ও, তার মানে আপনি এতক্ষণ ব্যঙ্গ করছিলেন? তা ঠিকই করছিলেন, কারো দুর্ভাগ্য নিয়ে ব্যঙ্গ করা আপনারই সাজে।"

মেজবৌদি গম্ভীর হয়ে গেলেন। গম্ভীরমুখেই বললেন, "কারো দুর্ভাগ্য নিয়ে ব্যঙ্গ করা কারোরই সাজে না সেজবৌ, ওটা বিধাতা-পুরুষেরই একচেটে। তিনি তো অহরহই মানুষের ভাগ্য নিয়ে রঙ্গ-ব্যঙ্গ খেলার ছক পেতে বসে আছেন, মানুষের আর সে খেলায় রুচি থাকার কথা নয়।"

"বেশ, তা হলে কি বলতে চান আপনি? সারা জীবনটাই তো ওর পড়ে আছে, নতুন করে আবার জীবন শুরু না করে শুধু এমনি বসে বসে জীবনটা বাজে খরচ করে কাটিয়ে দেবে?"

মেজবৌদির মুখের গাম্ভীর্যে একটু হাসির আভাস দেখা দেয়, সেই হাসির মতই হালকা করে বলেন তিনি, "খরচ করবার সুশৃঙ্খলা পদ্ধতি জানা থাকলে কোন জীবনই বাজে খরচ হয় না সেজবৌ! এই তো দেখ না কেন তোমারই ছোটমামা, আদৌ বিয়েই করলেন না, সংসার করলেন না। অথচ তুমিই কি বলতে পারবে তাঁর জীবনটা বাজে খরচ হল?"

সেজবৌয়ের ছোটমামা একজন সমাজসেবী মহৎপ্রাণ ব্যক্তি, কাজেই তাঁর উদাহরণে সেজবৌ একটু থতমত খেল। খেয়ে বলল, "সবাই কি ওঁর মত সন্ন্যাসী হবে না কি?"

মেজবৌদি হেসে বলেন, "সন্ন্যাসী কোথা? দিব্যি ভাল পোশাক-পরিচ্ছদ, দিব্যি ভাল খাওয়া-দাওয়া, তুমিই তো বল ঘোরতর শয্যাবিলাসী, এসব কিছু আর সন্ন্যাসীর লক্ষণ নয়!"

"ওসব তো বাইরের। আসলে তো বলতেই হবে ত্যাগী। ওঁর কথা আলাদা। কিন্তু মানুষ হচ্ছে রক্তমাংসের জীব, তাকে সে দাবি মানতে হবে বৈ কি।"

"তা তো অবশ্যই"—মেজবৌদি একটু চকিত হাসি হেসে বলেন, "তার নজীর তো কতই আছে। এই আবারও তোমার দিকেই দেখ।

তোমার ওই পিসতুতো দাদা! মাস তিনেক বোধ হয় হল যাঁর স্ত্রীবিয়োগ হয়েছে, তিনি কি এখন থেকেই টোপরের দর করছেন না?"

সেজবৌ একবার চমকে উঠেই মুখ লাল করে বলে ওঠে, "তার মানে? এটা কে বলল? ওঃ বুঝেছি। লুকিয়ে পরের চিঠি পড়াতেও আপনার দ্বিধা নেই!"

মেজবৌদি আবার গম্ভীর হন, বলেন, "কার কিসে দ্বিধা আছে আর নেই, সে তর্ক থাক সেজবৌ! মানুষের জাত চেনবার বুদ্ধি কারো কারো থাকে, ওটা বিধাতাদত্ত ক্ষমতা, ও নিয়ে কথা চলে না। সন্দেহ করলে নাচার। কিন্তু আমি বলি কি, সুচেতার ভবিষ্যতের ভাবনাটা তুমি না হয় ছেড়েই দাও না! আরও তো লোক রয়েছে সংসারে।"

সেজবৌ ক্রুদ্ধস্বরে বলে, "আমিও রয়েছি। সংসারের বাইরের লোক নই আমি। সংসারে আরো যাঁরা আছেন, তাঁদের বিবেচনার ফল তো প্রত্যক্ষ করা গেল, এবার হাত বদল করেই দেখা যাক না।"

সুচেতার সঙ্গে সৌরেশের বিয়ের ব্যাপারে মেজবৌদিই ছিলেন সুচেতার প্রধান সহায়, অতএব সেই প্রসঙ্গ তুলে একহাত নিতে পারার সুযোগ লাভে পুলকিত হয়ে ওঠে সেজবৌ, তাই কথা শেষ করেই ফের বলে, "তখন আমাদের পাঁচজনের কথা শুনলে আর এই অবস্থা হত না। মানুষ যখন প্রেমে পড়ে, তখন কি আর তার ভাল মন্দ বিচার থাকে? কথায় বলে অন্ধদেবতা! তার চাইতে চোখকান-খোলা অভিভাবকরা যা ভাল বুঝে করে, সেই ব্যবস্থাই মাথা পেতে নেওয়া উচিত।"

মেজবৌদি হেসে ওঠেন, "মানুষের গড়া শাস্ত্রে যা যা উচিত বলে গণ্য আছে, মানুষ যদি তাই মেনে চলতে পারতো সেজবৌ, পৃথিবীটা তো তাহলে স্বর্গ হয়ে উঠতো!"

"তবু মানুষ উচিত কথা বলতেও ছাড়বে না মেজদি!" বলে ঝটকা মেরে চলে যায় সেজবৌ।

চলে গিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে একটা কাগজ কলম নিয়ে খসখস করে তার সেই সদ্য-বিপত্নীক পিসতুতো দাদাকে লিখতে শুরু করে, 'শ্রীচরণেষু প্রতুলদা, তোমাকে যে মেয়ের কথা বলেছিলাম, সে সম্বন্ধে কথা এই, মেয়ে নিজে অরাজী না থাকলেও তার আত্মীয়েরা অনিচ্ছুক। যদি তাদের সম্মত করাতে পারি পুনরায় খবর দেব, খুব চেষ্টায় রইলাম। তোমার শূন্য সংসারের চেহারা স্মরণ করে আমার তিলার্ধ শান্তি নেই—' ইত্যাদি।

বুদ্ধি করে মেয়ের পরিচয় দেয় নি আগে, এখন মনে মনে নিজেই বুদ্ধির তারিফ করে।

কিন্তু বুদ্ধির খেলায় শেষ অবধি জিততে পারলে, তবে না! এক ঢিলে দুই পাখী মারা হচ্ছিল। এ বাড়ি থেকে সুচেতার চিরস্থায়ী আসনের উচ্ছেদ, ও বাড়িতে অর্থাৎ পিসতুতো দাদার বাড়িতে নিজের স্থায়ী আদরের আসনের বনেদ।

তা শত্রুতা সাধছেন ওই মেজগিন্নীটি!

চিরদিনই যিনি তার সঙ্গে শত্রুতা সেধে এসেছেন। সেজবৌকে ছোট করে রাখাই যেন তার জীবনের পরম আনন্দ। সন্দেহ নেই, সেবারে মেজগিন্নী সুচেতার বিয়ের সহায়ক হয়েছিলেন, শুধু সেজগিন্নী বিরোধী ছিলেন বলেই। আর এবারে সেজগিন্নী উদ্যোগী বলেই তাঁর এত বিরুদ্ধাচরণ।

ওদিকে মেজবৌদি কিছুক্ষণ কি যেন চিন্তা করে স্বামীর দরবারে হানা দেন। এবং তারও কিছুক্ষণ পরে সুচেতাকে গিয়ে বলেন, "এই, চাকরি চাকরি করে মরছিস, আমার কাছে একটা চাকরি আছে, করবি?"

সুচেতা হেসে ফেলে বলে, "তোমার কাছে চাকরি করলে মাইনে পাওয়া যাবে?"

"নিশ্চয়! কত চাস?"

"এই—কতই আর! শ পাঁচেক।"

"মাত্র? অত কমে চলবে? যাকগে আমি দাতা মানুষ, যা চাইছিস দিয়েই দেব পাঁচশো কাণাকড়া মাইনে ধার্য হল তোর।"

"চমৎকার! কাজটা কি?"

"গরু চরানো।"

গরু চরানো!

"হুঁ। ঠিক গরু নয়, বাছুর বলতে পারিস। বাড়িতে যেকটা আছে গুণে গেঁথে নিয়ে যাবি, চরিয়ে আবার ফেরৎ আনবি। তাছাড়া—" —দুষ্টু হাসি হাসেন মেজবৌদি।

"কি তাছাড়া?" সন্দিগ্ধ প্রশ্ন সুচেতার।

"মানে আর কি, তোরও একটু চরে বেড়ানো দরকার।"

"আমার? তার মানে? কেন?"

মানে খুব সোজা। তুই যদি অনবরত তোর সেজবৌদির সামনে বসে থেকে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিস, সে তাহলে অবিলম্বে তোকে তার সেই বৌ-মরা পিসতুতো দাদার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেবে। সেই ভয়েই"—হাসতে হাসতে পালিয়ে যান মেজবৌদি।

তিনি ভাবছিলেন মনের পরিবর্তন দরকার। সত্যিই অবিরত ঘরের কোণে বসে মন নিয়ে বিলাস করলে, শরীর মন দুইয়েরই স্বাস্থ্য ভাঙে। বাইরের আলোয় ঘোরাফেরা করতে করতে স্নায়ু সবল হয়।

গাড়ির ব্যবস্থা করিয়ে দিলেন মেজবৌদি। রোজ বিকেলে। মেজদা কোর্ট থেকে ফিরতে যা দেরি।

ছেলেদের তো স্ফূর্তির জোয়ার এসেছে। বাড়িতে দু-দু-খানা গাড়ি থাকা সত্ত্বেও তাদের ভাগ্যে এ রকম নিয়মিত বেড়ানোর সুযোগ বড় জোটে না। কাজের গাড়ি কাজের লোকের জন্যে, এই নিয়ম। অতএব আজকাল বিকেল হতে না হতেই তাদের সাজ-সাজ রব শুরু হয়।

আর এটি এমন একটি সুবিধাজনক ব্যবস্থা যে সেজবৌদিও প্রতিবাদ করেন না। মেজবৌদির নির্দেশিত হলেও না। কারণ তাঁর ছেলেমেয়ে কটাকে চরানোই সর্বাধিক শক্ত।

অতএব রোজ এক একদিকে অভিযানের উৎসব।

ড্রাইভার মহবুব বেশীর ভাগই নিষ্ক্রিয়, স্টিয়ারিং থাকে সুচেতার হাতে। আর গাড়ি চালাতে চালাতে সুচেতার মনের কানে কানে হঠাৎ গম্ভীর কোমল কণ্ঠ নিঃসৃত একটি কথা উচ্চারিত হয়, 'গতিই জীবন সুচেতা, গতিই সকল দুঃখ-নিবারক। তুমি যদি খানিকটা বেড়িয়েও আসো—'

হ্যাঁ, লক্ষ্য করছে সুচেতা, শুধু খানিকটা বেড়িয়েই এখনও এ মনটাও অনেক ভালো হয়ে যায়। ছোটদের সঙ্গে মিশে ছেলেমানুষী করতেও ভাল লাগে এক এক সময়। সাহস পেয়ে ওরাও কাছে এগিয়ে আসছে, আবদার করছে। মনের সুস্থতা ফিরে পাচ্ছে সুচেতা।

এক একটা ছুটির দিনেটিনে দূর দূর পথে পাড়ি।

বোটানিক্‌স্ কি দমদম এরোড্রোম, বেলুড় কি দক্ষিণেশ্বর, সোনারপুর কি পাণিহাটি, যে কোনো কোথাও।

কিন্তু?

কিন্তু নিতান্ত নিকটবর্তী নিতান্ত সহজ একটা পথে কিছুতেই নয়!

কে বলবে কেন? কেন এই পথটা একটা জমাট বিভীষিকার রূপ নিয়ে বসে আছে মনের সামনে? এখানে কেন সুস্থ বুদ্ধিটা আসছে না কিছুতেই? এখনও সেই পথটা ধরে যাবার দরকার পড়লে কেন সুচেতা ডবল তেল পুড়িয়েও ঘুর পথের জটিলতা সৃষ্টি করে?

এই 'কেন'র উত্তর সুচেতার বুদ্ধির কাছে নেই।

বহুবার এই দৌর্বল্যকে ঝুঁটি ধরে নাড়া দেবার চেষ্টায় সুচেতা দাঁতে দাঁত চেপে সে রাস্তার কাছাকাছি এসে পৌঁছেছে, ভেবেছে 'কিছুই নয়' এই ভাবে সোজা সেই বাড়িটার সামনে দিয়ে চালিয়ে চলে যাবে বেপরোয়া ভঙ্গীতে, কিন্তু ঠিক সাহসের মুহূর্তেই হঠাৎ হারিয়ে ফেলেছে সমস্ত সাহস। দম বন্ধ হয়ে এসেছে, কান মাথা ঝাঁ ঝাঁ করে উঠেছে, স্টিয়ারিং-ধরা হাতটা গিয়েছে অবশ হয়ে। হঠাৎ হাতের সমস্ত শক্তি জড়ো করে ঝটকা দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়েছে গাড়ি।

না না, সে বাড়িটাকে আর কিছুতেই দেখা চলবে না চোখ চেয়ে।

তবুও একদিন ঘটে গেল সেই দুর্বিপাক !

মহরমের না কিসের যেন একটা জমায়েৎ বেরিয়েছে পথে, খানিকটা রাস্তা পড়ে গেছে পুলিশী নিয়ন্ত্রণের কবলে ! খানিকটা ঘুরে যেতে হবে।

আর সেই ঘুরে যাওয়ার সোজা পথটা হচ্ছে থিয়েটার রোডের সেই অংশটা। যেখানে একটা বুনো ভয়ের বাসা ঘাপটি মেরে বসে আছে সুচেতার জন্যে। যার কাছাকাছি এলেই সুচেতার বুকের ভিতরটা জমে পাথর হয়ে আসে।

বাসা খোঁজা থেকে শুরু করে, বাসা ছাড়া পর্যন্ত হয়তো সহস্রবার সেই পথ দিয়ে আনাগোনা করেছে সুচেতা, যে রাস্তায় প্রত্যেকটি ইঁট-কাঠ তার মুখস্থ, তবু এত ভয় কিসের সুচেতার ?

সুচেতা এত দুর্বল ! এত নার্ভাস !

আচ্ছা যদিই সেই পথ দিয়ে গাড়ি চালিয়ে চলে যায় সুচেতা, যদিই সেই মহামুহূর্তে গাড়ির গতি ঈষৎ মন্থর করে দিয়ে একবার তাকিয়ে দেখে—সেই বাড়িখানা আজও পথের ধারে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে কিনা তার অজস্র ছোট ছোট 'খোপে' ভরা বিশাল দেহটা নিয়ে, তাহলে কী হতে পারে ? কী হওয়া সম্ভব ?

একবার দাঁতে দাঁত চাপল সুচেতা, তারপর মনের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে এগিয়ে চলল স্টিয়ারিং-ধরা অবশ হাতটাকে স্ববশে এনে।

না, ভয়ানক একটা কিছু ঘটে গেল না।

আকাশের জায়গাতেই আকাশ রইল, মাটির জায়গায় মাটি। শুধু তারপর থেকে আকাশ-বাতাস-মাটি, পথ-বাড়ি-ট্রামবাস, শহরের চলমান জীবনযাত্রা, সব কিছুর ওপর যেন সুচেতা ছেঁড়া ঘুড়ির মত ছায়া ফেলে ফেলে ভেসে বেড়াতে লাগল এক টুকরো রঙ্-জ্বলা বিবর্ণ মলিন ছবি।

সে ছবি ছোট্ট একটু ঝুল-বারান্দা, তার পিছনে দু-খানা-ঘর, আর সে ঘরের দেয়ালে পর্দা-ঝোলানো সারিসারি কটা জানলা-দরজা !

কিন্তু ওই বিবর্ণ কুৎসিত ছিঁড়ে ঝুলে-পড়া পর্দাগুলো কোন্ রঙের ছিল।—নীল? সবুজ? গেরুয়া?

কে জানে কি, সে আর এখন ধরবার উপায় নেই। কে জানে কত দিনের রোদ বৃষ্টি আর ধুলোয় এমন অদ্ভুত ধোঁয়াটে একটা রঙ্ তৈরি হয়!

এখন কি কেউ দেখে বুঝতে পারবে ওগুলো কী সুন্দর শৌখীন দেখতে ছিল? বুঝতে পারবে কালো সুতোর বর্ডার টানা গেরুয়া রঙের ওই পর্দাগুলোয় যখন সকালের রোদ এসে লাগত, ঘরের ভিতরটা কেমন একটা সোনারঙা হয়ে উঠত?

কেউ বুঝতে পারবে না, কিন্তু সুচেতা পারছে অনেক কিছুই বুঝতে পারছে সুচেতা।

পর্দাগুলো যে মানুষটা হাতে করে টাঙিয়েছিল, সে মানুষটা যেদিন ওই সোনারঙ ঘরের মোহ ত্যাগ করে চিরকালের মত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে চলে এসেছে, সেই তখনকার দিন থেকেই ওগুলো ঝুলে আছে ওই জানলা-দরজা কটা আশ্রয় করে। ওদের আর কেউ বদলায় নি, খুলে ফেলে দেয় নি।

শতবার ভাবতে চেষ্টা করল সুচেতা, আজও যে হতভাগা লোকটা ওই ঘরে বাস করে, সে কী ভীষণ অপদার্থ! কী সৃষ্টিছাড়া অলস, কী অদ্ভুত নোংরা!

লোকটার প্রকৃতি যেন ভুলে গেছে সুচেতা, এই ভাবেই ইচ্ছে করে আরো কঠোর করে ভাবতে থাকে—একটা চাকরও তো আছে, এই সামান্যটুকুও করিয়ে নেবার ক্ষমতা হয় নি? কিন্তু কিছুতেই শেষ পর্যন্ত কঠোরতা বজায় থাকে না। সমস্ত ছাপিয়ে সমস্ত প্রাণটা আছাড় খেতে থাকে অদ্ভুত একটা যন্ত্রণায়। আর ওই বিবর্ণ মলিন ছবিখানা রোদে-জ্বলা, জলে-ভেজা সুতো-কাটা ঘুড়ির মত চকিত ছায়া ফেলে ফেলে ভেসে বেড়াতে থাকে আকাশ বাতাস, মাটি পথ বাড়ি, ট্রাম বাস, শহরের চলমান জীবনযাত্রা, সব কিছুর ওপর।

একটিবার গিয়ে ওই বিবর্ণ ছবিখানা টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে আবার নতুন রঙ্ বুলিয়ে দিয়ে আসা যায় না ? আর বাড়ির মনিবকে না হোক তার চাকরকেও ধিক্কার দিয়ে আসা যায় না—তোরা মানুষ না ভূত ?

কিন্তু চাকরটাই কি টিঁকে আছে ?

সময়ে মাইনে আর যথাসময়ে অন্ন দিয়ে তাকে টিঁকিয়ে রাখবার দায়িত্বই কি কেউ নিয়েছে ? কে জানে হয়তো কোন লোকজন নেই, হয়তো জানলার ওপিঠে ঘরের ভিতরকার অবস্থাও ওই পর্দাগুলোর মতই হয়ে উঠেছে। হয়তো কোনদিনও আর ঝাড়ামোছা হয় না, আর ঝাড়া-হাত-পা লোকটা হোটেলে রেস্টুরেণ্টে খেয়ে দিনগত পাপক্ষয় করে।

ফেরার সময় অন্য রাস্তা দিয়ে আসা চলতো, পুলিশী নিয়ন্ত্রণের জের মিটে গেছে ততক্ষণে, কিন্তু ইচ্ছে করেই ফের সেই পুরনো পথে গাড়ি চালিয়ে এলো সুচেতা। আতঙ্কের ছায়াদৈত্যকে একবার ঠেলা মেরে ফেলে দিতে পারলে অনেক কিছু সহজ হয়ে আসে, তখন বরং ভেবে অবাক লাগে এই তুচ্ছ জিনিসটাকে এত প্রাধান্য দিচ্ছিলাম কেন ?

ফেরার সময় রাত হয়ে গেছে।

ধোঁয়াটে বিবর্ণ সেই রংটা তখন গাঢ় কালো লাগছে, জানলাগুলো খোলা, ভিতরে আলো জ্বালা নেই। সন্ধ্যার আলো কি আর জ্বলে না কোনদিন ? নিজেকে কি ও একেবারে অন্ধকারের হাতে সমর্পণ করেছে ?

বাড়ি ফিরে আসবার সময় দূর থেকেই দেখতে পেল নিজেদের বাড়ির আলো ঝলসানো রূপ ! বাড়ির বাইরে বারান্দার নীচে একটা চড়া আলো জ্বলবে সন্ধ্যা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত, এ সুচেতার মেজদার কড়া হুকুম।

সে আলোটা জ্বলছে।

ঝকঝক করছে বাড়িটা। ঝকঝক করছে সুচেতার ঘরটাও। কারণ এ ঘরে মেজদার বছর দশেকের মেয়ে সুমিতারও আধাআধি বখরা। এখানে পড়া তৈরি করে সে। আগে অন্য ভাইবোনদের সঙ্গে

নীচের তলায় পড়তো, সুচেতা আসার পর থেকেই এ ব্যবস্থা। সত্যি, আস্ত একখানা ঘর একলা সুচেতা করবেই বা কি ?

সুমিতা বেড়াতে যায় নি আজ, সুমিতার নাকি সামনে পরীক্ষা। তাই সুচেতার ঘরে একশো পাওয়ারের আলোটা জ্বেলে দুলে দুলে পড়া মুখস্থ করছে সে।

গাড়ি থেকে নেমে ছেলে মেয়েরা হৈ হৈ করে বাড়ি ঢুকে পড়ল। সুচেতাও ঢুকল মহবুবকে গাড়ি তুলতে বলে। আর বাড়ি ঢুকে বার বার মনে হতে লাগল—বড্ড বেশী আলো, বড্ড বেশী আলো ! বড্ড চড়া, বড্ড কড়া ! ভয়ানক অস্বস্তিকর !

সব আলো নিভিয়ে স্তব্ধ নিথর অন্ধকারে তলিয়ে গিয়ে দেখতে পারলে হতো একটু স্বস্তি আসে কিনা।

ঘরে গিয়ে বলল, "এই সুমি, তুই নীচে পড়ার ঘরে গিয়ে পড়গে যা তো লক্ষ্মীমেয়ে !"

সুমিতা ঠিক তার মায়ের মত ঈষৎ বিস্ফারিত বড়বড় চোখ দুটো তুলে বললো, "কেন ?"

নিতান্তই নির্দোষ প্রশ্ন বেচারার, কিন্তু ছোট্ট এই 'কেন' টুকুই যেন দপ্ করে আগুন ধরিয়ে দিল সুচেতার মধ্যে। কী ব্যাপার কি ! কৈফিয়ৎ চায় নাকি ? রুক্ষ গলায় সেই কথাই বলে উঠল, "কেন তার কৈফিয়ৎ না দিলে যাবে না তুমি ?"

"যাবো না কে বলেছে"—সশব্দে বই বন্ধ করে, ও আরও সশব্দে চেয়ার ঠেলে উঠে গট্‌গট্ করে চলে গেল দশবছরের সুমিতা। আর কিছুক্ষণের জন্যে যেন আলো নেভাতেও ভুলে গেল সুচেতা। ভুলে গেল এটা বাড়ির ধারা। সুচেতা নিজেও তিন বছর বয়স থেকে এমনি অসহিষ্ণু। সুচেতাকে যদি কেউ একটু সরে বসতে বলতো তো রাগ করে সে, ঘর থেকে বেরিয়ে যেত, আরো কম বয়স থেকে।

সে সব ভুলে গিয়ে শুধু মনে হতে লাগলো এরা তাকে অসম্মান করছে, তাকে অবান্তর ভাবছে। ভাবছে যেখানে সুচেতার কোন

দাবি নেই সেখানে আবার হুকুম চালায় কোন অধিকারে? যে মেয়ে, একখুনি হয়তো গিয়ে মায়ের কাছে পাঁচখানা করে 'লাগাবে', আর মেজবৌদি তার প্রতিক্রিয়ায় টিপেটিপে বাক্যবাণ নিক্ষেপ করবেন। সুচেতার কখনো মা ছিল না। না, জ্ঞান হয়ে কখনো মাকে দেখে নি সুচেতা। হঠাৎ এই সাতাশ বছর বয়সে মাতৃহীনতার দুঃখ অনুভব করেই বুঝি সুচেতার চোখ ফেটে জল এল সমস্ত স্নায়ু মুচড়ে!

আলো নিভিয়ে দিয়ে বিছানায় পড়ে পড়ে কাঁদতে লাগল সুচেতা, যে মাকে জন্মমুহূর্তে হারিয়েছে সেই মাকে স্মরণ করে।

মা থেকে বাবা! বাবা থাকলে কি আজ—

তারপর কখন একসময় চোখের জল শুকিয়ে গেল, স্নায়ুরা সুস্থির হল, তলিয়ে গেল অদেখা মা আর অতি শৈশবে দেখা বাপের স্মৃতি। সহসা খেয়াল হল নিতান্ত একটা অবান্তর কথা ভাবছে সে।

কালো সুতোর বর্ডারটানা উজ্জ্বল গেরুয়ারঙের কখানা পর্দা কবে একদিন কোন দোকান থেকে কিনেছিল, এই সামান্য কথাটুকু কি ঘর অন্ধকার করে বিছানায় পড়ে পড়ে ভাববার কথা?

অনেকদিন কোর্টে যাওয়া হয় নি, আজ হঠাৎ সমস্ত অস্বস্তি সবলে ঝেড়ে ফেলে কয়েক ঘণ্টার জন্যে কোর্টে গিয়েছিল সৌরেশ। বেরিয়েই চমকে উঠল।

গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে বিপিনদা!

জীর্ণ শীর্ণ কঙ্কালসার চেহারা। কিন্তু গলায় সেই কোঁচানো চাদরটি ঠিক পাকানো আছে। আছে ফর্সা আর্দির চুড়িদার, হাতে সিগারেট। বিপিনদাকে কতকাল পরে দেখল সৌরেশ?

কাছে এসে পকেট থেকে গাড়ির চাবিটা বার করতে করতে আক্ষেপ আর বিস্ময় মাখানো স্বরে প্রশ্ন করলো, "কি বিপিনদা, খবর কি? কী চেহারা হয়েছে তোমার?"

"আর চেহারা!" বিপিনদা এক টুকরো দার্শনিক হাসি হেসে বলেন, "বেঁচে উঠেছি এই ঢের। বাঁচার কিছুই ছিল না। খবর টবর তো আর নিস না, আছি কি মরেছি বাড়ির মায়াটা কাটিয়েছিস বটে!"

এতগুলো কথার বদলে একটা মাত্রই কথা বলে সৌরেশ, "কি হয়েছিল কি?"

"হবে আবার কি!" বিপিনদা সিগারেটে একটা টান দিয়ে বলেন, "মহৎ ব্যক্তিদের যা হয়! লিভার পচে ওঠার প্রতিক্রিয়া! যাকগে মরুকগে! এখন আজ একটু চল দিকি দাদা, বেশ মৌজ করে তুচার গ্লাস টানা যাক।"

সৌরেশ একবার চমকে উঠল। কিন্তু সে কি শুধুই বিপিনদার ভবিষ্যৎ ভেবে?

অবশ্য ওর কথাটা তাই বোঝালো।

"বল কি বিপিনদা, এই অবস্থা, এখুনি আবার?"

"তুই আর হাসাস নি স্বুরো, ভূতের আবার চোরের ভয়! নেহাৎ নাকি শয্যেগত হয়ে পড়ে বৌ ছেলের কবলে পড়ে গিয়েছিলাম তাই—"

"না না বিপিনদা এটা ঠিক নয়"। সৌরেশ আন্তরিকতার সঙ্গে বলে, "একটু সাবধান হওয়া উচিত।"

"এই সেরেছে!" বিপিনদা হতাশার ভঙ্গী করে বলেন, "তুইও এলি উচিত উপদেশ দিতে? থাম বাবা থাম, ঘরে বাইরে কণ্টকশয্যে আর সহ্য হয় না। পয়সা খরচ করতে না চাস তো সোজাসুজি মুখের ওপর ঝাড়া জবাব দিয়ে দে, ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কাটিস নে!"

"আচ্ছা ওঠো তো গাড়িতে!" গাড়িতে উঠে সৌরেশ বলে, "তুমি বুঝছো না বিপিনদা, তোমার যা চেহারা দেখছি এরপর অত্যেচার করলে মারা পড়বে।"

"কী বললি? মারা পড়বো?" বিপিনদা খ্যাক খ্যাক করে হেসে ওঠেন, "মারা পড়বো? সেই ভয় দেখাতে এসেছিস? সেই ভয়ে

আমি ঘরে গিয়ে তুলসীপাতা আর গঙ্গাজল খেয়ে টিঁকে থাকবো ? বলি বেঁচে কবে রইলাম যে মারা পড়বো ? আজীবন তো মরেই আছি ! সদুপদেশ দিতে এলেই চটাচটি হয়ে যাবে সুরো ! সাদা বাংলায় বলে দে পয়সা খরচা করতে কুণ্ঠিত হচ্ছিস কি না ?”

সৌরেশ হতাশ সুরে বলে, “চিরকাল তুমি একই রকম রয়ে গেলে বিপিনদা ! পয়সা খরচ করতে কুণ্ঠিত হচ্ছি না ভেবে, ভাবো না তোমাকে আত্মহত্যার সহায়তা করতে কুণ্ঠিত হচ্ছি !”

“ভেবেছি বাবা ভেবেছি !” বিপিনদা সিগারেটটায় শেষ টান দিয়ে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলেন, “তোর সদিচ্ছার ওপর আমার অবিশ্বাস নেই। জানি তুই তোর ওই অর্থপিশাচ বৌদিটির মত শুধু টাকার জন্যে বারণ করিস না, কিন্তু কি করবো বল সুরো, পারি না ! এই ছ'টা সাতটা মাস কী যমযন্ত্রণা গেছে ? হাসপাতালের নার্সগুলোর পায়ে পর্যন্ত ধরেছি, হাউহাউ করে কেঁদেছি, খাটের রেলিঙে মাথা ঠুকেছি—”

সৌরেশ বাধা দিয়ে বিচলিত সুরে বলে, “আচ্ছা বিপিনদা, সত্যিই কি এ রকম হয় ? না এ সব মনগড়া ?”

“মনগড়া ?” বিপিনদা সৌরেশের স্টিয়ারিং ধরা নীটোল হাতটার ওপর নিজের কাঁকড়ার দাড়ার মত হাতখানার একটা চাপড় মেরে বলে ওঠেন, “মনগড়া মানে কি ?”

‘মানে, সত্যিই কি কোন যন্ত্রণা হয় ? না মনে মনে ভেবে ঠিক করো—যেহেতু আমি নেশাখোর এবং যেহেতু নেশার বস্তুটা পাচ্ছি না, সেইহেতু আমার যমযন্ত্রণা হওয়া উচিত ! অতএব কাঁদবো লাফাবো চেঁচাবো—”

বিপিনদা হাত সরিয়ে নিয়ে হতাশ আক্ষেপের সঙ্গে ব্যঙ্গের মিশেল দিয়ে উদাস উদাস ভাবে বলেন, “তা বলবি বৈ কি ! কথাতেই তো আছে ‘চিরসুখীজন ভ্রমে কি কখন ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে !’ হাতে পয়সা আছে, জোয়ান বয়েস আছে, ইচ্ছে মতন পান করবার উপায় আছে—”

"দূর, ও পান টান করি না, ছেড়ে দিয়েছি!"

"ছেড়ে দিয়েছিস? বিপিনদা শিথিল ভঙ্গী ছেড়ে ফের টান টান হয়ে বসে বলেন, "ছেড়ে দিয়েছিস মানে?"

সৌরেশ হেসে ওঠে, "মানে আর কি, খাই না।"

বিপিনদাও হেসে ওঠেন, "কদিন? হু'দিন না তিন দিন? প্রথম বয়সে ওরকম ছাড়া আমিও ঢের ছেড়েছি রে সুরো! যখন বৌ পয়সার খোঁটা দিয়েছে, নিজের ছেঁড়া শাড়ি আর ছেলে মেয়েগুলোর ছেঁড়া ছেঁড়া জামাগুলো এনে আমার নাকের সামনে মেলে ধরেছে, ভেবেছি—ধুত্তোর আর ও ছাই খাব না। থাকে না রে, ও প্রতিজ্ঞা থাকে না। ও যে কী জিনিস!" বিপিনদা একটু উচ্চাঙ্গের হাসি হাসেন।

"দূর! তুমিও যেমন, ওর আগাগোড়াই খারাপ! কিন্তু কই বিপিনদা, আমিও তো মাঝে মাঝে খেয়ে এসেছি, কই আমার তো কিছু যন্ত্রণা হয় না?"

"যন্ত্রণা হয় না?" বিপিনদা সন্দিগ্ধ স্বরে বলেন, "কতদিন খাস নি?"

"তুমিই জানো। তোমার সঙ্গে ছাড়া—" একটু হেসে চুপ করে সৌরেশ।

"আমার সঙ্গে ছাড়া আর খাস না তুই?" বিপিনদা সহসা গম্ভীর ভাবে বলেন, "গাড়িটা বাঁধ সুরো, নেমে পড়ি।"

"কেন?" অবাক হয় সৌরেশ।

"নাঃ, দাদা হয়ে আর তোর সর্বনাশ করবো না। বুঝেছি, তুই আমার ওপর দয়া করে খাস।"

"কী যে বল বিপিনদা!" সৌরেশ হেসে ওঠে, "ওসব কিছুই না। ইচ্ছে হয় না, ছেড়ে দিয়েছি। চল চল, কিন্তু কথা দাও বেশী খাবে না? সত্যি, বেজায় বিশ্রী অবস্থা হয়ে গেছে তোমার!"

টেবিলের ধারে বসে গ্লাসের আদেশ দিয়ে বিপিনদা কেমন করুণ মুখে বলেন, "তুই তাহলে সত্যিই খাবি না সুরো?"

সৌরেশ আবার হেসে ওঠে, "কী মুস্কিল! তাতে তোমার অত খেদ কেন?"

"খেদ নয় রে সুরো, খেদ নয়। লজ্জা! কী হাসছিস? ভাবছিস বোধ হয় বিপিনদারও আবার লজ্জা হয়! হয় রে মাতালের শরীরেও এক আধ জায়গায় লুকোনো থাকে ও জিনিসটা! নাঃ আজ যা হলো, হলো, আর তোকে ত্যক্ত করতে আসবো না।"

সৌরেশ কি বিচলিত হচ্ছে?

হয়তো হচ্ছে, তবু সামলে নেয় নিজেকে। চোখ সরিয়ে নেয় বিপিনদার কোটরাগত চোখ দুটোর দিক থেকে, সরিয়ে নিয়ে বলে, "কি যে বল বিপিনদা! আমারই কি এ প্রতিজ্ঞা চিরদিন থাকবে? হয়তো—"

"তোর হবে!" বিপিনদা নিশ্চিত সুরে বলেন, "তোকে তো জানি!"

গ্লাসের পর গ্লাস চালিয়ে যান বিপিনদা। কোন বাধা নিষেধ মানেন না। তারপর হঠাৎ বলেন, "তেজ করে আর কী করবো রে সুরো, জগতে তুইই যা একটু ভাল বাসিস, আনিস মাঝে মাঝে!"

"কিন্তু তোমার শরীরটা ভাল করা চাই।"

"আর শরীর! কথা জড়িয়ে আসে বিপিনদার, আর হঠাৎ যেন অতি সাধারণ অতি তুচ্ছ একটা কথা মনে পড়ে গেছে এইভাবে জড়িয়ে জড়িয়ে বলে ওঠেন, "ভাল কথা, তোর সেই ভাব করে বিয়ে করা বৌটা নাকি তোকে ছেড়ে পালিয়ে গেছে? বলছিল ওরা কাগজে নাকি বেরিয়েছে। হতেই হবে। ওসব বৌটৌ সব বাজে বুঝলি সুরো, সব বাজে। এই হচ্ছে জগতের সার!"

কথা আরও জড়িয়ে আসে। সৌরেশকে আর উত্তর দেবার প্রয়োজন হয় না।

সেদিন সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে বিছানার ওপর একটা প্যাকেট দেখে অবাক হয়ে গেল সৌরেশ। এটা আবার কি, এটা কোথা থেকে এল? হাত দেবে কি দেবে না? বাঁধন খুলবে কি—খুলবে না?

চাকরটা টিঁকেই আছে ধরতে হবে, কারণ তাকে যখন ডাক দিতে দেখা যাচ্ছে। অথবা কোন নতুন আমদানি। সৌরেশ ডেকে বলল, "এটা কি রে?"

"কি জানি বাবু, একটা লোক দিয়ে গেল।"

"লোক মানে কি রকম লোক?"

"এই—ইয়ে মতন আর কি—চাকর কেলাশ।"

"হুঁ কেলাশ চিনতে শিখে ফেলেছিস দেখছি। তুই চিনিস না তাকে?"

"জন্মে দেখি নি।"

"কি বলে দিল জিনিসটা?"

"বলল, ঘরে রেখে দিতে, বাবু দেখলে বুঝতে পারবেন।"

"বলল, আর তুই তাই মেনে নিলি? ধর যদি বোমাই হল?"

"বোমা?" হেসে ফেলল চাকরটা, "বোমা কি আর নরম-নরম হয় বাবু? কাপড়-জামা কিছু হতে পারে।"

"গণৎকার!" বলে প্যাকেটটা হাতে তুলে নেয় সৌরেশ। কাপড় গোছেরই কিছু হবে মনে হচ্ছে।

টেনে ছিঁড়ল কাগজের আবরণটা, আর ছিঁড়েই স্তব্ধ হয়ে গেল। কালো সুতোর বর্ডার টানা উজ্জ্বল গেরুয়া রঙের কয়েকখানা পর্দা! বিদ্যুতালোকে কিছুটা জোর দেখাচ্ছে, কিন্তু নিশ্চিত জানা—সকালের আলোয় হালকা হয়ে উঠবে। আর সেই রোদে হালকা পর্দার রঙে ঘরের মধ্যেটা সোনারঙ হয়ে উঠবে।

"বাবু অমন বসে পড়লেন যে!" চাকরটা ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করল। স্পষ্ট তো দেখা যাচ্ছে ছিট কাপড় মত কি যেন একটা, বোমা-টোমা কিছুই নয়, তবু বাবুর মুখখানা অমন আগুনে ঝলসানো মত দেখাচ্ছে কেন রে বাবা!

সৌরেশ ওকে হাত নেড়ে ঘর থেকে চলে যেতে বলল।

পর্দাগুলো বিছানায় ছড়িয়ে রেখে তাকিয়ে দেখল জানলা-দরজা গুলোর দিকে। কালো কালো ন্যাতার মত যেগুলো ঝুলে রয়েছে ওদের গায়ে, ওগুলোও একদিন ঠিক এই রকমই ছিল না ?

কী বিশ্রী হয়ে উঠেছে এখন ওরা, কী জঘন্য ! কোনদিন কি সৌরেশ ওদের দিকে একবারের জন্যও তাকায় নি ? হ্যাঁ তাকিয়েছিল, কিন্তু সে অন্য কথা।

কিন্তু আরও কেউ তবে এখনও তাকায় ?

আচ্ছা, এই দেওয়াটা কী ?

মমতা, না ব্যঙ্গ ?

মমতা ? সৌরেশ কি পাগল ? ব্যঙ্গ, ব্যঙ্গ, সম্পূর্ণ ব্যঙ্গ !

হাতের কাছেই টেলিফোন-রিসিভারটা, ওটা তুলে নিয়ে আর টেবিলে-বসানো গোল ঐ চাকাটার গায়ে পর পর যে সংখ্যাগুলো বসানো রয়েছে সেগুলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিশেষ একটি সংখ্যায় সাজিয়ে ফেলে এখনই প্রশ্ন করা যায়—কী এটা তোমার ? বল কি ? উপহাস ? কিন্তু উপহাসেরও তো কোথাও কোনখানে সীমা থাকে !

'মমতা' বলে ভাবতে পারলে কী অদ্ভুত সুন্দরই হয়ে উঠত পৃথিবীটা।

প্রতিদিনের মত আলো নিভিয়ে অন্ধকার ঘরে পড়ে থাকলেও, সেই অন্ধকারটাই এক অলৌকিক অনুভূতিতে সোনারঙা হয়ে উঠত।

কিন্তু এত দুঃসাহসিক ভাবনা ভাবতে পারা কি সহজ ?

গ্রহ নক্ষত্ররা কোথায় বসে থাকে ? কোন অলক্ষ্য জগতে ? সেই সুদূর অলক্ষ্য জগৎ হতে মানুষের ভাগ্যজালের সূত্রটা নিয়ে কেমন করে তারা 'জটপাকানো' জটপাকানো' খেলা খেলে ?

আকাশ অন্তরীক্ষ, গ্রহনক্ষত্রের জগৎ সব কিছুই আজ মানুষের নখদর্পণে এসে গেছে, তারা কে কখন কোন পথে চলছে, আর কোথায় দৃষ্টি ফেলছে এ রহস্য নির্ভুল অঙ্কে মানুষের কাছে জলের মত স্পষ্ট। শুধু এই তথ্যটাই আজও রহস্যাবৃত রয়ে গেছে মানুষের

ভাগ্যজালের নিয়ন্ত্রণ রজ্জুটা তাদের হাতে দিল কে ? কে দিল মুষ্টিমেয় কয়েকটি শক্তির হাতে অনাদিকালের পৃথিবীর লক্ষকোটি মানুষের জীবন আর ভাগ্যের ওপর আধিপত্যের অধিকার ?

একদা বোকা মানুষরা যা হয় কিছু বানিয়ে বানিয়ে যেমন হোক একটা দিশে আবিষ্কার করে রেখেছিল, আজকের বুদ্ধিমানের পৃথিবীতে সে আবিষ্কার ভূয়ো হয়ে গেছে। সেটা ভূয়ো হয়ে গেছে, কিন্তু নতুন কোন উদ্ঘাটন নেই। অথচ গ্রহনক্ষত্ররা কোন অতীতে কে জানে কার কাছে পাওয়া সেই জীর্ণ দলিলের বলেই আজও অপ্রতিহত বিক্রমে চালিয়ে যাচ্ছে প্রজাশাসন।

নইলে সৌরেশ আর সুচেতা কার খেয়ালের খেলায় হঠাৎ আবার একদিন মুখোমুখি হয়ে গেল ? ওরা নিজেরা কি জীবনে কোনদিন ভেবেছিল ওরা দু'জনে একই সময় একই জায়গায় বেড়াতে যাবে ?

তবু গেল।

ওদের দু'জনের জন্মলগ্নে অবস্থিত গ্রহনক্ষত্ররা একটু কৌতুকের খেলা খেলতে বসলো হয়তো ! অথচ বিশেষ কোন উৎসব উপলক্ষের দিন নয় যে, এই যোগাযোগের একটা কারণ আবিষ্কার করা চলে। নেহাৎ সাদামাঠা একটা বিকেল। সুচেতা এসেছে ভাইপো ভাইঝি-দের নিয়ে বেড়াতে ব্যারাকপুরে গান্ধীঘাটে, যেমন প্রায়ই আসে এখানে। কিন্তু সৌরেশ ? সৌরেশ কেন এল ?

সৌরেশ নিজেই কি জানে কেন এল ? কই আগে সুচেতার সঙ্গেও তো কখনো কোনদিন এখানে আসে নি। তাহলেও বা হৃদয়গত প্রেরণার একটা কারণ খুঁজে পাওয়া যেত। শেষ পর্যন্ত গ্রহনক্ষত্রের খেলা ছাড়া আর কি বলবার আছে !

কিন্তু সৌরেশের ব্যবহারের বিষয়েই বা বলবার আর রইল কি ? অদ্ভুত ! অদ্ভুত ওর সাহস ! হলেই বা পুরুষমানুষ ! সাহসের একটা সীমা থাকবে না ? তা সৌরেশের বোধ হয় সীমাজ্ঞানের বালাই বলে কিছু নেই, নইলে আর কেউই কি পারত সৌরেশের অবস্থায়

সৌরেশের মত এমন সহজ স্বচ্ছন্দে সুচেতার সঙ্গে কথা কয়ে বসতে ?

পারত সহসা একেবারে পাশে বসে পড়ে বলতে, "দেখ তবুও তুমি বিধাতাকে মানো না" ? গঙ্গার দিকে মুখ করে ঘাটের সিঁড়িতে বসেছিল সুচেতা, হঠাৎ বিদ্যুৎ লাগার মত ছিটকে উঠে দাঁড়াল, উঠে দাঁড়িয়েই হঠাৎ যেন বোবা হয়ে গেল।

আর সুচেতার ওই বোবা হয়ে যাওয়ার অবসরে সৌরেশ প্রায় হেসে পরিষ্কার গলায় বলে ফেলল, "জানলার পর্দাগুলো কিন্তু আমি নিজে হাতে লাগাব না।"

এ কী! এ কী নির্লজ্জ নিষ্ঠুরতা!

এই কথাটুকু বলবার জন্যে এমন কাছাকাছি এসে বসেছিল ?

কিন্তু কোন কথাই বা আশা করেছিল সুচেতা ?

তবু সুচেতার গলা দিয়ে স্বর ফুটল না। শুধু একবার অসহায়ের মত চারিদিকে তাকালো। খানিকটা উঁচুতে খোলা চাতালে ছেলে মেয়েরা ছুটোপাটি করছে, দূরে রাস্তার উপর গাড়ি নিয়ে মহবুব। সেই রাস্তা দিয়ে দূরে দূরে দুএকটা লোক চলছে, আর কেউ কোথাও নেই।

আছে, গঙ্গায় দুএকটা নৌকো আছে। আর আছে আকাশে ভেসে বেড়ানো হালকা মেঘের দল, আর গোধুলির সোনা। হয়তো সৌরেশ কিছু না বললে সুচেতাও কিছু বলত না, শুধু দাঁড়িয়ে থেকে থেকে এক সময় চলে যেত। হয়তো সৌরেশ অন্য কোন কথা বললে ভালমত একটা উত্তর দিত, কিন্তু এই শ্রীহীন কথায় ওর মুখে উত্তর যা জোগাল, সেটা রূঢ় কঠিন।

এত স্পষ্ট কথার উত্তরে জিনিসটা সম্বন্ধে অজ্ঞতার ভান দেখানো যায় না, যায় না অস্বীকার করা। তাই সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিয়ে বসল সুচেতা, "বেশ তো, সেটুকু জানাবার জন্যে এতটা শ্রম স্বীকার করবার দরকার ছিল না। পাড়ার ডাস্টবিনগুলো যদি উঠে গিয়ে থাকে,

ফুটপাথের ধারগুলো অবশ্যই আছে। আর জঞ্জাল-ফেলা গাড়িও নিশ্চয়ই এখনও আসে পাড়ায়।"

আশ্চর্য! সৌরেশ হাসল। হেসে বলল, "তোমার মেজাজটা কিন্তু অবিকল এক আছে। অবশ্য সেটাই আশার কথা। মেজাজই তো আসল মানুষটা। মেজাজের মৃত্যু মানে মানুষটারই মৃত্যু। কিন্তু তুমি বোধ হয় একটু ভুল বুঝছ। না টাঙাবার কারণ অবহেলা নয়, অন্য কিছু।"

"শুনে সুখী হলাম।"

"আমিও তাই। কিন্তু তুমিই বল, পর্দায় আমার দরকারটা কি?"

সুচেতা ঝেঁজে উঠে বলে, "দরকার যদি নেই তো কতকগুলো ছেঁড়া ন্যাতা ঝুলিয়ে রাখবারই বা কী দরকার?"

"দেখতে পেয়েছিলে বুঝতেই পারছি। এটাও আশ্চর্য! বোধ হয় অসতর্কে কোন সময় ওই পথ দিয়ে গিয়েছ, তাই না? কিন্তু এমনও তো হতে পারে ওগুলো রেখে দেবারও অন্য কোন কারণ ছিল। আজও আছে।"

"বাজে কথা আমি বিশ্বাস করি না।"

"বিশ্বাস করতে অনুরোধ করছে কে?" হেসে ওঠে সৌরেশ, "তোমার করুণার দান সযত্নে আলমারিতে তুলে রাখব। কিন্তু ওই পুরনোগুলো ঝুলুক।"

সুচেতা তীক্ষ্ণস্বরে বলে, "যারা অক্ষম তারাই পুরনোকে আঁকড়ে ধরে রেখে ভাবপ্রবণতার বড়াই করে।"

সৌরেশ মৃদুহেসে বলে, "তোমার মেজাজটা ঠিক আছে, কিন্তু স্মৃতিশক্তিটা নষ্ট হয়ে গেছে। কোন কিছুতেই বড়াই করা যে আমার স্বভাব নয়, সেকথা তুমি যেমন জানো এমন আর কেউ জানে না জানো তো?"

"আমি কোন কিছুই জানতে চাই না, সরো যেতে হবে

অবশ্য 'সরো' বলাটা অর্থহীন, সঙ্কীর্ণ একটা পথের মুখে পথ আগলে নেই সৌরেশ। কিন্তু সে কথা বলল না সৌরেশ, বলল না যে, 'তোমার পথ থেকে তো আমি নিজেকে সরিয়েই নিয়েছি সুচেতা'—বরং বলল, "যদি না সরি ?"

"সীন ক্রিয়েট কোরো না। ছোট ছোট বাচ্চাদের নিয়ে এসেছি, ওখানে মহবুব দেখতে পাচ্ছে।"

"পেলেই বা ?" সৌরেশ হেসে ওঠে, "ভয় করছে না কি তোমার ?"

"ভয় মানে ?" ভারি তীক্ষ্ণ শোনালো সুচেতার কণ্ঠস্বর।

"ভয় মানে ভয়। বেশ তো, সাহস আছে তার প্রমাণ দাও না ? নিজে হাতে পর্দাগুলো লাগিয়ে দেবে চল না ?"

"পাগলামীর একটা সীমা আছে।"

"পাগলামী ! ওঃ ! আচ্ছা তবে থাক। যেগুলো আছে সেইগুলোই থাক।"

হঠাৎ হর্ণ দিয়ে উঠল মহবুব, কেন কে জানে।

এই হর্ণে ছেলেদের হুটোপাটির প্রবল আলোড়নের ওপর যেন একটি ঢিল পড়ল। সুচেতা চাপা তীক্ষ্ণ স্বরে তাড়াতাড়ি বলল, "ওগুলো কি কোনদিন একেবারে ধ্বংস হবে না ? সব জিনিসেরই তো একটা শেষ আছে।"

"হয়তো আছে" সৌরেশ বলে, "শেষ নেই শুধু আশার আর প্রতীক্ষার সেটা তো রইল আমার নিজের এক্তারে ! সেইটাকে তো আর"—হেসে ওঠে সৌরেশ—"আইনের জোরে কেড়ে নিতে পারবে না ?"

আরও হর্ণ পড়ছে ঘনঘন। কে জানে, নিছক সময়-সঙ্কেতই এটা, নাকি মহবুবের ইচ্ছাকৃত কারসাজি। ও কি অত দূর থেকে দিদিমনিকে একটা অচেনা লোকের সঙ্গে কথা কইতে দেখেছে ? তাই এই সাবধানতা ? ও নতুন লোক, ওর ভয় বেশী।

"এখনো তোমার আশা আর প্রতীক্ষা ?" চাপা গর্জন করে ওঠে সুচেতা, "তুমি রক্তমাংসের মানুষ, না ইট-পাথর ?"

"রক্তমাংসের মানুষ সুচেতা" হঠাৎ সুচেতার কাঁধে একটা হাত রেখে সৌরেশ প্রায় ওর স্বভাব-বহির্ভূত আবেগের স্বরে বলে ওঠে, "পুরোপুরি রক্তমাংসের মানুষ। তাই তো ইচ্ছে করছে তোমাকে আর ছেড়ে না দিতে, ইচ্ছে করছে তোমাকে গায়ের জোরে তুলে নিয়ে সামনের ওই নৌকোগুলোর একখানায় চেপে সমস্ত চেনা জগৎ থেকে পালিয়ে যেতে।"

সুচেতা কি কিছু উত্তর দিত ? না কি দিতে পারত না ?

কে জানে কি হত! কিন্তু মহবুবের শিঙাধ্বনি তখন সপ্তমে উঠেছে, আর ছেলেমেয়ে কটা খেলা ছেড়ে সুচেতার দিকে না তাকিয়েই 'ছোটপিসি চলিয়ে' বলে চিৎকার তুলে গাড়ি লক্ষ্য করে দৌড় দিয়েছে।

সুচেতা একবার অসহায়ের মত তাকিয়ে বলে, "আমি যাই।"

সৌরেশ একটু সরে দাঁড়িয়ে মৃদু হেসে বলে, "বাধা দেবার উপায় কি ? মনের ইচ্ছে কাজে পরিণত করতে চাইলে তো আরও একবার কাঠগড়া !"

সুচেতা একবারটি দু'চোখ তুলে তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিয়ে দ্রুতপায়ে এগিয়ে যায় গাড়ির দিকে।

ছেলেমেয়ে কটা তখন ঠেশে গুঁজে গুছিয়ে বসে ছোটপিসির জন্যে জায়গা রাখছে।

শুধু একজন ফিস ফিস করে অপর একজনকে বলল, "ওই লোকটা ঠিক ছোট পিসেমশাইয়ের মত দেখতে।"

অপরজন আরও ফিসফিসিয়ে বলল, "দূর বোকা, ছোট পিসেই তো! ছোট পিসি কথা বলছিল বলে তাকাই নি আমি! বাড়িতে যেন বলিস নি কাউকে।"

"কথা বলতে নেই, না রে ?"

"কি জানি! বড়পিসি তো বলেছিল, 'সম্পর্ক চুকে গেছে'।"

"চুকে যাওয়া মানে কিরে?"

"বাবা কী বোকা রে তুই, মানে জানিস না? মানে হচ্চে কথা বলতে নেই, ওবাড়ি যেতে নেই—"

সুচেতাকে দেখে আলোচনা থেমে গেল।

কিন্তু আর একটা জায়গায় আলোচনা উদ্দাম হয়ে উঠেছে। সে জায়গা বাইরে কোথাও নয়, স্থির স্তব্ধ চেহারার একটা মানুষের মনের মধ্যে।

'সুমতি-কুমতি'র দ্বন্দ্বের মত সেই আলোচনা।

একপক্ষ অবিরত নিজেকে সমর্থন করবার চেষ্টা করছে, আর অপরপক্ষ তাকে ধিক্কার দিয়ে চলেছে।

সুচেতা কেন কিছুতেই পারল না নির্লিপ্তের ভঙ্গীতে উদাসীন হয়ে থাকতে? কেন পারল না সাধারণ পরিচিত লোকের সঙ্গে সৌজন্য দেখানোর মত সহজ কথা কইতে? কেন পারল না ওই তার নিতান্ত নির্বুদ্ধিতার সাক্ষী সেই পর্দাগুলোর কথা অস্বীকার করতে?

যতবার দু'জনের মধ্যেকার কথাগুলো মনে মনে উচ্চারণ করতে লাগল, ততবারই নিজের গালে নিজে একটা চড় বসিয়ে দিতে ইচ্ছে করল।

ব্যাপারটা যে ঘটে গেল বড্ড আকস্মিক বড্ড অপ্রত্যাশিত!

অনেক উদ্দাম ঝড়ের বেগ বহন করে করে অবশেষে স্থির করল সুচেতা, আরও একবার অন্ততঃ দেখা করা দরকার। নইলে মান থাকছে না। সেই দেখা করার মধ্যেই সে তার হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করে নেবে। সৌরেশকে দেখিয়ে দেবে কেমন নিরুত্তাপ ভদ্র ব্যবহারের মাধ্যমে সম্পর্ক মুছে ফেলার স্বাক্ষর বহন করা যায়।

কিন্তু দেখা করাটা কি করে সম্ভব?

সেজবৌ বড় ননদকে কাছে টেনে মুচকে হেসে বলে, "শুনেছেন তো?"

সুজাতা আজকাল বাপের বাড়ি আসা কিছু কমিয়ে দিয়েছে। কেন কে জানে তার সর্বদাই মনে হয় তাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্যক সম্মানটা যেন আর থাকছে না এখানে।

আজ এসেছিল।

সেজবৌয়ের কথায় ভুরু কুঁচকে বলল, "কী শুনবো?"

"আপনার ছোটবোনটি তো আবার প্রেমে পড়ছেন।"

সুজাতা আর প্রশ্ন করল না, শুধু ভুরুটা কুঁচকে তাকিয়ে রইল। প্রশ্ন করে খেলো হতে রাজী নয় সে।

সেজবৌ বলল, "কী আর বলব বড়দি, মেজদিকে তো জানেনই, তিনি যা বোঝেন তার ওপর আর কথা নেই। আমি বরং ন্যায্য কথাই বলেছিলাম যে, যখন এতবড় জীবনটা পড়ে রয়েছে তখন কোন একটা ব্যবস্থা করা হোক।"

সুজাতা তীক্ষ্ণ প্রশ্ন করল, "ব্যবস্থা মানে?"

ঝট করে মনে পড়ে গেল সেজবৌয়ের, সুজাতা পুনর্বিবাহ-বিরোধী, তাই ঢোক গিলে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "মানে নতুন করে আবার পড়ানো, কি কোন কাজটাজ শেখানো, একটা কিছু নিয়ে থাকতে তো হবে? তা নয়, মেজদি অর্ডার দিলেন মন খারাপ করে থাকে, রোজ বিকেলে গাড়ি নিয়ে হাওয়া খেতে বেরোক।"

"বটে না কি!" সুজাতা দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে বলে, "কার সঙ্গে যাওয়া হয়?"

"কার সঙ্গে আর! নিজেই তো গাড়ি চালাতে ওস্তাদ, মহবুব থাকে মাত্র। তবে নেহাৎ না কি দেখতে খারাপ, তাই ছেলেপেলে ক'টাকে উপলক্ষ করা হয়েছে, এই আর কি! তা শুনছি না কি ব্যারাকপুরে গান্ধীঘাটে ওদের ছেড়ে রেখে গঙ্গার ঘাটে একলা সরে গিয়ে কার সঙ্গে হাসি গল্প কথা। সে নাকি ওর হাত ধরেছে, কাঁধ ধরেছে—"

"চমৎকার!" সুজাতা মুখ বাঁকিয়ে বলে, "কী বাড়ি কী হয়েই উঠেছে! আমাদের আমলে এতটুকু বেচাল হবার উপায় ছিল না। ওই

একটি মেয়ে হতেই বাড়িতে যত রকম কেলেঙ্কারি হবার তা হল ! যাক, মাঝে মাঝে আসতাম, তাও বন্ধ করতে হবে।”

সেজবৌ পরম ব্যাকুল হয়ে বলে, “আমার ওপর যেন রাগ করবেন না বড়দি ! মহবুব নাকি চুপি চুপি ছোট ঠাকুরপোকে বলেছে। নতুন লোক ও, ওর তো প্রাণে ভয় ধরতে পারে। আমায় আর কে কি বলে বলুন ? ছোট ঠাকুরপো হেসেহেসে মেজদিকে বলছিল, তাই শুনতে পেলাম। যাক, আমি ঠিক করেছি আমার ছেলেমেয়েদের আর বেড়াতে যেতে দেব না। কী দরকার এসব পাকামীর মধ্যে থাকবার ?”

সুজাতা নাক কুঁচকে বলে, “আমার বোন হয়ে ও যে কি করে ও রকম হল, ভাবতেই পারছি না। তোমাদের বড় নন্দাই তাই যখন তখন বলেন, ভাগ্যিস তুমি তোমার বোনের মত হও নি ! অবিশ্যি স্নেহ ওকে খুবই করেন। এই তো কতবার বলেন, সুচেতা যদি আমাদের সংসারে এসে থাকে, কোনদিনই ভার মনে করব না। স্বচ্ছন্দে চিরদিন জায়গা দিতে পারবো। কিন্তু ও তো সে রকম না।”

সেজবৌ কি বলত কে জানে, ঘরে এসে ঢুকে পড়লো স্বয়ং আসামী। একেবারে হাসতে হাসতে ঢুকে বলে ওঠে, “ইস্ দিদি, একথা তো কই আগে কোনদিন বল নি ! জামাইবাবু আমাকে চিরদিন জায়গা দিতে পারবেন, কোনদিনই ভার মনে করবেন না, এ আশ্বাস আগে পেলে কি আর কখনো অন্য কোন দিকে তাকাতাম ?”

সুজাতা ভারীমুখে বলে, “তোমাকে জায়গা দেবে এত ক্ষমতা কার আছে ? তোমার উপযুক্ত জায়গা আমরা কোথা পাব ? আমরা সোজাসুজি এই জানি—কারো ভাগ্য মন্দ হলে আপনার লোক তাকে দেখে শোনে, কাছে টানে। কিন্তু সে যদি উড়তে চায়, কে কি করবে ?”

“তা’ বটে দিদি”—সুচেতা হাসিমুখেই বলে, “যে ভাগ্যহতের পাতালে পুঁতে থাকবার কথা, সে যদি আকাশে উড়তে চায়, আপনার লোকদের তো দুর্ভাবনা হবেই। কিন্তু পৃথিবীতে এই রকম দুর্মতির দলই বেশি, এই ঝঞ্ঝাট !”

"সেই দলই বেশি—একথা বলে নিজেকে তুমি যতই সমর্থন কর, আমি তা মানব না। তোমার মত অবস্থায় আমি পড়লে, আর যাই হোক অন্ততঃ আবার কাউকে গাঁথতে চেষ্টা করতাম না, তা জেনো।" সুজাতা ঘৃণার চরম অভিব্যক্তি মুখে ফুটিয়ে কথা শেষ করে, "তোমার অবস্থায় পড়লে, প্রেমে-পড়া, বিয়ে করা এ সবের ওপর জন্মের ধিক্কার এসে যেত আমার, পুরুষজাতটার ওপরই চিরকালে ঘেন্না এসে যেত।"

সুচেতা ফের হেসে ওঠে। হেসে বলে, "ভাগ্যিস আমার অবস্থায় পড় নি তুমি দিদি! পড়লে সমগ্র পুরুষজাতির কী দুরবস্থাই না হ'ত! কিন্তু আবার আমি প্রেমে পড়েছি—এ খবরটি কে পরিবেশন করল তোমায়? খুব সম্ভব আমাদের সবজান্তা বৌদি?"

সুজাতা মুখ ঘুরিয়ে বসে।

আর সেজবৌ ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে যেন দেয়ালকে উদ্দেশ করে বলে, "পরকে ভেঙিয়ে যা সুখ পাওয়া যায়! আমার ছেলেমেয়েরা আর কেউ বেড়াতে যাবে না! জানিয়ে দিলাম।"

শেষ কথাটায় চমকে গেল সুচেতা।

চমকেই বুঝে নিল কেন সেজবৌয়ের এই মনোভাব! নিশ্চয় গতকালের ঘটনা বাড়িতে প্রকাশ হয়ে গিয়েছে।

উঃ কী ভয়ানক ওই টুকু টুকু ছেলেগুলো! যে মানুষটা একদা তাদের বাড়িতে নিকট আত্মীয়ের মূর্তিতে আসা যাওয়া করেছে, কত ভাল বেসেছে, কত খেলনা পুতুল দিয়েছে, তাকে এত শত্রু ভাবতে পারলও তো! কে ওদের নিখুঁত করে শিখিয়েছে, ওর সঙ্গে সম্পর্ক রাখা নিষেধ? সুচেতাকে ওর সঙ্গে কথা কইতে দেখলে বাড়ি এসে লাগিয়ে দিতে হয়?

বেচারা বাচ্চাগুলোর ওপর অবিচার করল সুচেতা। তারা ভয়ে ভয়ে কিছুই বলে নি। হয়তো বললেই ভাল হত, সত্য কথা প্রকাশ পেলে বাড়ির আবহাওয়া অন্য এক চেহারা নিত। সকলে সুচেতাকে একটা নীতিহীন রুচিহীন বাজে মেয়ে বলে ভুল করে বসত না।

হ্যাঁ, সে ভুল সকলেই করেছে !

এমন কি মেজবৌদিও আহত গম্ভীর মুখে বললেন, "তোমার প্রতি আমার এর চাইতে কিছুটা উঁচু ধারণা ছিল সুচেতা !"

"ছিল, অর্থাৎ এখন আর নেই, কেমন ?" তীক্ষ্ণ হাসি হেসে বলে সুচেতা।

মেজবৌদি বলেন, "এসব আলোচনা যত কম হয়, ততই ভাল সুচেতা ! আমি ভেবেছিলাম—"

"কী ভেবেছিলে ? বল ? থামলে যে ?"

"না থাক," বলে চলে যান মেজবৌদি।

বিকেলের দিকে লক্ষ্য করল সুচেতা, কোর্ট থেকে মেজদাকে এনে গাড়ি গ্যারেজে ঢুকে গেল। ছেলেমেয়েদের কারো মধ্যে বেড়াতে বেরোবার মত কোন উৎসাহ দেখা গেল না।

'ঠিক আছে !' দাঁতে ঠোঁট চেপে আপন মনে উচ্চারণ করল সুচেতা। তারপর খানিকক্ষণ গুম্ হয়ে বসে থেকে হঠাৎ কি ভেবে এতদিনের মধ্যে যা কোনদিন করে নি তাই করল, বাড়ি থেকে একা বেরিয়ে গেল।

বাড়ি আর তার পরিবেশ অসহ্য হয়ে উঠেছে !

আশ্চর্য ! কি ভেবেছে এরা ?

ওদের কাটা ছকখানায় নিজেকে যে সেঁটে দিতে না পারবে, তাকে কিছুতেই সমর্থন করবে না ওরা ? সব মানুষগুলোর কি একই প্রবৃত্তি ?

আর এও মজা—একটা বেওয়ারিশ মানুষ দেখলেই প্রত্যেকের চেষ্টা তাকে নিজের আয়ত্তে আনবে, নিজের কাজে লাগাবে। শুধু একটা মানুষ নিজেকে নিয়ে আছে, এ যেন কী এক অনিয়ম ! কিছুতেই এ অনিয়ম চলতে দেওয়া হবে না। যদি তাকে কোন কাজেই লাগাতে না পারা যায় তো, অন্ততঃ সৎপথের পথ বাৎলে দাও তাকে। তাহলেও যেন নিশ্বাস ফেলে বাঁচে এরা।

সন্ধ্যা হয় হয়।

একা রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো যায় না পায়ে হেঁটে। একটা ট্যাক্সি নিল সুচেতা, কিন্তু কোথায় যাবে? কোন আত্মীয়ের বাড়ি? কোন সহপাঠিনীর বাড়ি?

কোথাও না! কোথাও না!

কোন জায়গাটাই মনে করে ভাল লাগে না, শুধু এক অদৃশ্য আকর্ষণে টানতে থাকে কোন একটা দোতলার ছোট একটি ঝুল-বারান্দা, আর তার পিছনে রঙ-জ্বলা জীর্ণ শ্রীহীন পর্দা-ঝোলানো কয়েকট জানলা-দরজা।

ট্যাক্সিটাকে শুধু নির্দেশ দেওয়ার অপেক্ষা।

হ্যাঁ, আজও তেমনি রয়েছে! অবিকল!

শুধু একটা ঘরের মধ্যে আলো জ্বলছে বোঝা যাচ্ছে। কে আছে ওখানে?

চাকরটা কিছু কাজ করছে কি? না কি তার মনিব? দুই চোখ বিস্ফারিত করে তাকিয়ে থাকে সুচেতা স্থান কাল ভুলে।

একবার কি ঘরের মধ্যের লোকটা বেরিয়ে এসে দাঁড়াতে পারে না ওই ঝুল-বারান্দাটায়?

হঠাৎ চেতনা এল।

ছিঃ ছিঃ, এই ভাবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে সে? কী লজ্জা! কী লজ্জা!

কাকে দেখার কথা ভাবছে সুচেতা? এই সন্ধ্যাবেলা সেই হতভাগা লোকটা কি বাড়িতে আছে না কি? কে জানে হয়তো এখন কোথায় কোন্ ‘বারে’ পড়ে আছে বেহুঁশ হয়ে।

আর সুচেতা এইভাবে বেহুঁশ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তাকে দেখার আশায়?

গলায় দড়ি সুচেতার, গলায় দড়ি !

দ্রুত পায়ে খানিক এগিয়ে গিয়ে একটা চলন্ত বাসে উঠে পড়ে সুচেতা। এ নম্বরের গাড়ি তাদের বাড়ির কাছের নয়। তাহোক মাঝপথে নেমে আবার বদলাবে। তবু এখানে আর নয়।

হঠাৎ কাউকে না জানিয়ে একা বেরিয়ে পড়ার জন্য বাড়িতে যে সুচেতার বিরুদ্ধে কি অসন্তোষের ধোঁয়া জমে উঠেছে, সে বোঝবার ক্ষমতা তখন ছিল না সুচেতার।

রান্নাঘরে গিয়ে 'খিদে নেই খাব না', এই বলে এসে শুয়ে পড়ল বিছানায়।

সমস্ত পৃথিবী উদ্বেল হয়ে উঠেছে, উত্তাল হয়ে উঠেছে সমস্ত আকাশ বাতাস। মনের মধ্যে পূর্বরাগের মত এমন অদ্ভুত উত্তেজনা কেন ? গোপন প্রেমের মত এমন হৃদয়-কম্পনের অনুভূতি কেন ?

বাঁধ ভেঙেছে সমুদ্রের, জোয়ার এসেছে নতুন !

এ এক অদ্ভুত অনুভূতি ! এ এক অপূর্ব অভিসার সুখ !

নির্দিষ্ট একটি সময়ে প্রত্যহ একটিবার করে গিয়ে শুধু দূর থেকে দেখে আসা সেই ঝুল-বারান্দা, সেই জানলা। যেদিন অন্ধকার থাকে, সেদিন কাজ কিছু কম, শুধু একটু দাঁড়িয়ে থেকে খানিক পরে এসে একখানা চলন্ত বাসে উঠে পড়া।

কিন্তু যেদিন আলো জ্বলে ?

সেদিন কাজ বেশি। সেদিন দুই চোখ বিস্ফারিত করে দীর্ঘ প্রতীক্ষার প্রহর গুণতে হয়।

যদি ঘরের মধ্যের লোকটা একবারের জন্যও অকারণ অন্যমনস্কে ছোট্ট ওই ঝুল-বারান্দায় এসে দাঁড়ায় !

আশ্চর্য ! কোনদিনই তা হয় না।

ওঘরে যে থাকে সে কি অনড় ?

কিন্তু—কিন্তু—যদি চাকরটাই হয় ? কী লজ্জা ! কী লজ্জা !

কেন এমন দুঃসাহসিক আশা করছে সুচেতা যে, ঘরের প্রভুটি সুবোধ শান্ত মূর্তিতে সন্ধ্যাবেলা বাড়ি বসে আছেন ?

ছি ছি, সুচেতা কি বুদ্ধিভ্রংশ হয়ে গেছে ?

প্রতিদিন এই এক অভিজ্ঞতা।

প্রতিদিনই ভাবে ঢের হয়েছে আর নয়। কিন্তু আবার পরদিন কী যে হয়! সকাল থেকে মনের মধ্যে অপূর্ব এক অভিসারের রাগিণী বাজতে থাকে! আর বিকেল গড়িয়ে যেই সন্ধ্যা হয় হয় হয়ে ওঠে, তখনই বেরিয়ে পড়ে সুচেতা।

ওদিকে পিছনে ঝড় উদ্দাম হয়ে উঠেছে। অভিভাবককুল একটা বিশেষ প্রতিকারের চেষ্টায় মতলব ভাঁজতে শুরু করেছেন। এতবড় মেয়েকে, প্রায় স্বাধীন মেয়েকে বকে-ঝকে শাসন করা চলে না। একমাত্র পথ, অপমানের পথ। ঠাণ্ডা মাথায় বুঝিয়ে দেওয়া এ-বাড়িতে বসে এসব চলবে না!

কিন্তু বুঝিয়ে নেবার ভার নিলেন কিনা বড়দা!

যদি মেজদা সেজদা হতেন, সুচেতা নিজের স্বভাবে স্থির থেকে পরিষ্কার উত্তর দিতে পারত! পারত হয়তো বা তীক্ষ্ণ হাসি আর ধারালো কথা দিয়ে সেজদাকে মেজদাকে অপদস্থই করে দিতে, কিন্তু বড়দা!

যে বড়দা সংসারের সাতে পাঁচে কিছুতেই থাকেন না!

সুচেতা ধরতে পারে নি যে ব্যক্তি সাতে পাঁচে কিছুতেই থাকে না, হঠাৎ তার কানের কাছে সাত পাঁচ কথা তুলে যদি প্রতিকার চাওয়া যায়, যদি বলা হয় আমাদের দ্বারা হবে না, তুমি ছাড়া আর কারো সাধ্য নেই, তাহলে সে ব্যক্তি অন্ততঃ নিজের মান রাখতে অপরের মান অপমানের কথা তলিয়ে দেখে না।

সেজদাই গিয়ে আর্জি করেছিলেন বড়দার কাছে, "সুচেতা যা

স্বেচ্ছাচার চালাচ্ছে আজকাল, তা'তে তো আর এ বাড়িতে টেঁকা যায় না।"

বড়দা তাঁর গ্রন্থজগৎ থেকে চমকে মুখ তুলে বললেন. "স্বেচ্ছাচার মানে?"

"স্বেচ্ছাচার মানে স্বেচ্ছাচার। ওর আর দ্বিতীয় মানে তো কিছু নেই বড়দা! চট করে ব্যাপারটা তোমার কানে তুলতে চাই নি, ভেবেছিলাম ওর বৌদিরা বুঝিয়ে বলতেই সাবধান হয়ে যাবে, কিন্তু ঠিক উল্টো, উত্তরোত্তর বাড়িয়েই চলেছে।"

বড়দা হাতের বইখানা মুড়ে রেখে চেয়ারে পিঠটা টান করে বলেন, "খুব বুঝি সকলের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করছে?"

"ঝগড়াঝাঁটি!" সেজদা গম্ভীর ভাবে বলেন, "আমি একটা খোকা নই বড়দা যে সুচেতা বাড়িতে ঝগড়াঝাঁটি করছে বলে তোমাকে জানাতে আসবো! সুচেতা কি ঝগড়াঝাঁটি করবার মত সহজ সাধারণ মেয়ে?"

"আহা তা তো নয় জানিই। ভাবছিলাম এখন তো মনটন খারাপ, হয়তো সেইজন্যেই—কিন্তু তা হলে করছে কি?"

"যা করছে সেটা অনেক বেশী দুশ্চিন্তার!" সেজদা মুখটাকে প্রায় গোল করে তুলে বলেন, "আবার কোথায় কোন একটা হতভাগার সঙ্গে মিশে যা তা করে বেড়াচ্ছে।"

"তার মানে?" হঠাৎ যেন ঘুমন্ত বাঘ খোঁচা খেয়ে জেগে উঠে গর্জন করে উঠল, "কী ভেবেছে কী ও?"

"কী ভেবেছে সেইটাই তো বুঝতে পারছি না। যখন ইচ্ছে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়, প্রত্যহ সন্ধ্যেবেলা আড্ডা দিতে বেরিয়ে বাড়ি ফেরে রাত নটায়, এবং ওর বৌদিরা কিছু বললে এত অগ্রাহ্যভাব দেখায় যে মনে হচ্ছে শেষ পর্যন্ত অন্ততঃ আমাদের নিজেদের সম্ভ্রম বাঁচাতে এবাড়ি ছাড়তে হবে।"

"তোমাদের বাড়ি ছাড়তে হবে! বাঃ"—বড়দা দুই হাত উল্টে বলেন, "এ কী পাগলের রাজ্য না কি? ডাক ওকে, বুঝিয়ে দিচ্ছি

আমি, এ বাড়িতে বসে এসব চলবে না। ছি ছি, ও যে এত ইতর এত নির্লজ্জ, তা তো জানতাম না!"

"তুমি জানতে না, আমরা অনেকদিনই জানি।" বলে সেজদা তিনতলা থেকে থেমে এসে অনীতাকে নির্দেশ দেন, বড়দার বার্তা সুচেতাকে জানাতে।

সুচেতা কি বুঝতে পারে নি বড়দা হঠাৎ তাঁর তিনতলার জগৎ থেকে সুচেতাকে ডেকে পাঠালেন কেন?

বুঝতে পেরেছিল বৈ কি!

নিজেকে প্রস্তুত করেই সিঁড়ি দিয়ে উঠেছিল সে, কিন্তু তবু অভিমান-সমুদ্র উথলে উঠতে চাইছে। হৃদয়ের সমস্ত স্থিরতা, সমস্ত শক্তি, যেন নিরলম্ব হয়ে থরথরিয়ে উঠছে।

তাহলে এ বাড়িতে সুচেতার এই পদমর্যাদা! নিজের প্রতিটি আচার আচরণের জবাবদিহি দিয়ে দিয়ে বাস করতে হবে এখানে?

তবে যে সে দিন কোর্ট থেকে বেরিয়ে জগদীশ বলেছিলেন, "ব্যস, এবার তুমি সম্পূর্ণ স্বাধীন" সেটা শুধু ভুয়ো কথা!

সম্পূর্ণ স্বাধীন! সম্পূর্ণ স্বাধীন!

জীবনের কয়েকটি দিন মাত্র সে আস্বাদ পেয়েছে সুচেতা। সেই এতটুকু গৃহগণ্ডীর মধ্যে, নিজের নামের সঙ্গে অপরের পদবী বহন করে।

যাক মনোবিলাস। পৃথিবীর মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে এবার।

বড়দার দরজার কাছে এসে খুব শান্তভাবে বলল, "বড়দা আমায় ডেকেছ?"

বড়দা চীৎকার করে উঠলেন, "হ্যাঁ ডেকেছি! তুমি ভেবেছ কি বল দিকি?"

সুচেতার চোখে জল আসছিল, তবুও কষ্টে চেপে বলে, "কোন বিষয়ে ভাবনার কথা বলছ ঠিক বুঝতে পারছি না।"

"তা পারবে কেন!" বড়দা সমান তেজে বলে চলেন, "অসভ্য মেয়ে! বারে বারে তুমি এ রকম করবে? লজ্জা বলে কোন পদার্থ নেই তোমার?"

সুচেতা স্থিরভাবে বলে, "সে তো এ বাড়িতে কারুরই নেই বড়দা!"

বড়দা একটু থেমে যান। তারপর গলা নামিয়ে বলেন. "তা জানি, কিন্তু তোমার নামে যে সব কমপ্লেন শুনলাম, সে সব কি তুমি অস্বীকার করতে পারো?"

সুচেতা যদি বলতো, "কি কি কমপ্লেন শুনেছ আমার নামে তাই শুনি"—আর যদি সেই উত্তর প্রত্যুত্তরের ক্ষেত্রে প্রকৃত সত্যটা প্রকাশ হয়ে যেত, তাহলে হয়তো সমস্ত নাটকটাই অন্য চেহারা নিত। কিন্তু তা বলল না সুচেতা, বলল, "আমি নাবালক শিশু নই বড়দা!"

"ওঃ বটে বটে! তা বেশ! শিশু যখন নও তখন নিজের দায়িত্ব নেবার ক্ষমতা নিশ্চয়ই হবে। তাহলে সেই ব্যবস্থাই করো।"

সুচেতার চোখের কোণে আসা অভিমানের অশ্রু শুকিয়ে গিয়েছিল, ও শুধু তাকিয়ে থেকে দেখছিল।

সকলেই সমান, কারুর কাছেই আশা করবার কিছু নেই। ইনিই সেই চিরদিনের নির্লিপ্ত আর স্নেহশীল বড়দা!

বড়দা ওকে চুপচাপ থাকতে দেখে এবার ঈষৎ নরম গলায় বলেন, "দেখ, আমি এসব সাংসারিক কথায় থাকতে ভালবাসি না, কিন্তু যাতে বাড়ির নাম খারাপ হয়, বংশের মুখ ডোবে, এ রকম ঘটনা সংসারে ঘটতে থাকলে না দেখে উপায়ও নেই। আমি তোমার ভালর জন্যেই বলছি আবার ভুল করে বোসো না। ওসবে কী দরকার? কোন জ্বালা নেই ঝামেলা নেই, সুখে স্বচ্ছন্দে আছো, খাও দাও বই পড়ো, চুকে যাক ল্যাঠা। তা নয় ইচ্ছে করে দুঃখ ডেকে আনা! না পড়লে জীবন বৃথা হয়ে যাবে এরকম বইয়ের সংখ্যা জগতে কত আছে জানো? অগাধ অগাধ! একটা জীবন তো দূরের কথা, তিন জন্ম ধরে পড়লেও শেষ হবে না।"

তবুও চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে সুচেতা।

বড়দা বোধ করি ওর উত্তরের আশায় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আবার বলেন, "কাল থেকে সন্ধ্যেবেলা বাজে আড্ডা দিয়ে না বেড়িয়ে আমার এখানে উঠে এসো দিকি। তুমি সহজে বুঝতে পারবে এমন বই বেছে রাখবো, পড়াশোনা করবে।"

কেন জানি না, আবার একঝলক জল এসে পড়ে চোখের কোণে। হয়তো বড়দার শেষের কথাগুলিতে একটু স্নেহের সুর ছিল বলে। তবু অভিমান উগ্র হয়ে ওঠে।

"আমার জন্যে কাউকে কিছু ভাবতে হবে না।" বলে দ্রুতপদে নেমে যায় সুচেতা।

নেমে এসে দেখল কোথাও একটু নিরিবিলি নেই। সারা বাড়িটা এক কর্মচক্রে ভর করে বন্‌বন্‌ করে ঘুরচে। অথচ এ কর্মচক্রের সঙ্গে সুচেতার কোন যোগ নেই। এখানে সুচেতার অনধিকার প্রবেশ। তাই যে কোন মুহূর্তে এরা সুচেতার মুখের উপর বলতে পারে—'তোমার ব্যবস্থা তুমি করে নাও, তুমি পথ দেখ।'

কিন্তু কোথায় সেই পথ?

ঘর দালান সব এড়িয়ে রাস্তার ধারের বারান্দায় এসে দাঁড়ালো সুচেতা, তাকিয়ে রইল চলমান জনতার দিকে। ওদের সকলেরই জীবনের কোন লক্ষ্য আছে, ওদের আসা যাওয়ার ব্যস্ততার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন উদ্দেশ্য আছে, ওরা সুচেতার মত লক্ষ্যহীন নয়।

আচ্ছা, ওই পথে নেমে পড়লেই কি পথ খুঁজে পাওয়া যায়? সেই নেমে পড়াটা কেমন? সে কি শুধুই 'নেমে' পড়া? এগিয়ে যাওয়া নয়?

আজ যদি ছোড়দাকে এই অপমানটা করা হতো!

যদি বলা হতো—"তোমার ব্যবস্থা তুমি করে নাও", এই মুহূর্তে বেরিয়ে পড়তে পারতো সে, কোন ব্যবস্থা করতে না পারলে পড়ে থাকতে পারতো ফুটপাথে, স্টেশন প্লাটফরমে, বড়লোকের বাড়ির

গাড়িবারন্দার নীচে। সুচেতার উপায় নেই তেমনি তেজ করে বেরিয়ে পড়বার!

পড়েছিল। শুধু একদিন বেরিয়ে পড়েছিল। ঝড়বৃষ্টি মাথায় করে।

সেদিন মনে করেছিল মস্ত একটা আশ্রয় বুঝি আছে তার। আজ দেখছে সে আশ্রয় খড়কুটোর, মুহূর্তের ঝড়ে উড়ে যায়!

তবে কি সুচেতা ওদের অপবাদকেই সত্য করে তুলবে? আবার নতুন করে জীবন সঙ্গী নির্বাচন করবার সাধনা করবে?

ভাবতে গিয়ে সমস্ত অন্তরাত্মা 'ছি ছি' করে ওঠে।

দৈহিক অশুচির মত লাগছে এই চিন্তার অশুচিতা।

নিজের কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ এক সময় চিন্তা ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত বিশ্বের প্রবাহে। যেন সহসা একটা সত্য আবিষ্কৃত হয় সুচেতার মনের সামনে।

বাইরে থেকে যাদের দুর্বলতা দেখে, হাস্যকর আচার আচরণ দেখে অপরে হাসে, নিন্দে করে, ধিক্কার দেয়, তারা হয়তো সত্যই তেমন হাস্যকর নয়। হয়তো তারা যা করে সে শুধু তাদের নিরুপায়তায় করে।

তাদের অন্তরাত্মাও হয়তো সুচেতার মতই এমনি 'ছি ছি' করে ওঠে। তবু উপায় কি? পরগাছা হয়ে থাকবে এমন গাছই কি সকলের ভাগ্যে জোটে?

বেঁচে থাকতে হলে নিজের ঘর চাই একথা তারা অস্বীকার করে না। তাই বারবার জীবনসঙ্গী নির্বাচনের গ্লানি বহন করতেও বাধে না তাদের।

সুচেতাও কি তবে?

কিন্তু কোথায়? কোথায় সেই নির্বাচনের পথ? কিছুতেই কোন পথ মনে পড়ে না, মনে পড়ে শুধু একটি উদার হাস্যোজ্জ্বল মুখ।

সহসা আর চোখের জল বাঁধ মানে না।

বাঁধ মানে না সৌরেশের উপর অভিমানে। সবই তো ছিল সুচেতার, নিজের হাতে গড়া সুন্দর সুখের ঘর! সে ঘর তচনচ হয়ে গেল শুধু সৌরেশের তুচ্ছ একটা খামখেয়ালে!

কেন? কেন সৌরেশ ইচ্ছে করে ভেঙে দিল সুচেতার ঘর?

আর সুচেতা পাগলের মত ছুটে যায় দূর থেকে শুধু একবার সেই ঘরটুকু দেখতে? নিন্দে অপমান গ্লানি বহন করে অভিসারিকা নারীর মত?

নাঃ কাল থেকে সত্যিই আর এই পাগলামী করবে না সুচেতা।

আবার মনে পড়ে যায় ব্যারাকপুরের গঙ্গার ঘাটের সেই বিহ্বল মুহূর্তটুকু! সৌরেশের সেই ব্যাকুল কথা কটি!

কিন্তু সে ব্যাকুলতা কি সত্যি?

না কি সৌরেশ এমনই একটি পাকা অভিনেতা যে, শুধু অভিনয়ের চটকে সুচেতাকে বিভ্রান্ত করে ফেলতে সক্ষম হয়েছিল?

ঘুরে ফিরে কেবলই ওই একই কথা কেন? কেন সুচেতা সৌরেশকে মুছে ফেলতে পারছে না? জীবন থেকে যাকে মুছে ফেলেছে, মনের মধ্যে তার ছায়া পড়তে দেয় কেন? না না, আর কিছুতেই সৌরেশের সম্পর্কে কোন কথা ভাববে না!

কিন্তু ভাবাটা কি নিজের আয়ত্তে?

নিজের মনের মত অনায়ত্ত আর কি আছে জগতে? কে আছে এর চাইতে অবাধ্য?

সৌরেশকে ভাববে না এই সংকল্পটা স্থির হয়। কিন্তু আরও প্রবল একটা সংকল্প যে সমস্ত মন জুড়ে বসে আছে। সেদিনের 'শোধ দেওয়া' চাই যে! সেদিন ভারি অপদস্থ হয়ে গিয়েছিল সুচেতা, এবার একদিন সে ভুল শুধরে নিতে হবে।

ভুল শুধরে নেবার বাসনায় অনবরতই মনে হতে থাকে—'যদি এইভাবে দেখা হয়ে যায়', 'যদি এমন ভাবে দেখা হয়ে যায়'! সহসা দেখা হয়ে যাবার বহুবিচিত্র ছবি মনের মধ্যে ভীড় করে দাঁড়ায়, আর

সুচেতা একাই দুজনের মুখের কথা সাজিয়ে সাজিয়ে কথার মালা গাঁথতে থাকে।

সেই কথা গাঁথার শেষে, অনেক কথার পিঠে পিঠে পিঠ দিয়ে কথার শেষ তাস কুড়োনো হয় অবশ্য সুচেতার দিকেই। ধারালো ধারালো জোরালো জোরালো কথার আঘাতে সৌরেশকে ম্লান করে দিয়ে সেদিনের হৃতগৌরব ফিরে পাবে সুচেতা।

হৃতগৌরব ফিরে পাওয়ার কল্পনায় অসতর্কে যখন মনটা হঠাৎ পুলকিত হয়ে উঠেছে, তখনই সে মনের উপর সঞ্চরমান মেঘের মত একটা ছায়া এসে পড়ল।

গৌরব নিয়ে কি করবে সুচেতা? সে গৌরব দেখাবে কাকে?

ধুসর একটা শূন্যতা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় না সুচেতা।

সুচেতার জগতে আর এখন এমন কেউ নেই, সুচেতার গৌরবে যার পুলক, সুচেতার অপমানে যার অপমান। এমন কেউ নেই, সুচেতার কৃপাকটাক্ষে যে ধন্য, সুচেতার অকরুণায় যার শঙ্কা।

সুচেতা এখন কিছু নয়।

অর্থহীন মুল্যহীন শুধু একটা ভীড়ের মানুষ! যার জীবনের প্রধান কর্তব্য এখন আর পাঁচজনের মধ্যে নিজেকে মানিয়ে নেওয়া, মানিয়ে রাখা। সুচেতাকে মানবার দায় আর কারো নেই।

বাড়ির চাকর বাকরদের মুখের চেহারাতেও দেখেছে সুচেতা, সেই না মানবার উদ্ধত অবহেলা, কিশোরী ভাইঝিদের মুখেও দেখেছে সেই দায়হীন অবহেলার ইঙ্গিত।

মনের সমস্ত বৈকল্য বিলাস জোর করে দমন করে খবরের কাগজের কর্মখালির কলম দেখতে বসে সুচেতা।

'বাড়িতে কি হচ্ছে আজকাল?"

মেজদা ক্রুদ্ধ প্রশ্ন করেন গৃহিনীকে। "তুমিও কি লোকের দেখাদেখি সন্ধ্যাবেলায় হাওয়া খেতে বেরোও না কি ?"

মেজবৌ মৃদু হেসে বলে, "লোকের দেখাদেখি কোন কিছুই করা আমার স্বভাব নয়, তবে হাওয়া খেতে বেরোলেও দোষ দিতে পারো না তুমি। এ বাড়ির হাওয়ায় একটানা থাকতে থাকতে মাঝে মাঝে হাওয়া বদলের দরকারটা প্রবল হয়েই ওঠে।"

"হুঁ, এ বাড়ির তো সব কিছুই খারাপ দেখে এলে তুমি চিরকাল! অথচ তুমি ছাড়া আর যে কোন মেয়েই বোধ হয় এ বাড়ির বৌ হতে পেলে ধন্য হয়ে যেত।"

"ওই তো জ্বালা গো, যে যেখানে ধন্য হতে পারে তার সেখানে ঠাঁই জোটে না। যদি বা জোটে, হয়তো ভুল করে সে নিজেই নিজের সেই 'ধন্য' হবার জায়গাটা ভেঙে তচনচ করে ফেলে। কিন্তু ও কথা থাক, তলব কেন ?"

"কেন, কাজ না থাকলে কি খুঁজতে নেই ?" মেজদা অসহিষ্ণু ভাবে বলেন, "আজকাল কোন দিন যদি সন্ধ্যাবেলায় ঘরে থাকবে! সংসারের রান্না ভাঁড়ার ঘরে হঠাৎ কী এত কাজ বেড়ে গেল তোমার ?"

"রান্না ভাঁড়ার ঘর ছাড়া আর কি জায়গা নেই জগতে ? সেখানে কাজ বাড়তে পারে।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার কাজ জানতে আর বাকী নেই আমার!" মেজদা উদ্ধত ভাবে বলেন, "পাড়ারাজ্যের যত ভিখিরি কাঙাল হলো তোমার সাবজেক্ট। জগতকে তো চিনলে না এখনো! সত্যিকার অভাবগ্রস্ত নয়, তবু তোমার কাছে এসে ইনিয়ে বিনিয়ে দুঃখের গাথা গাইবে। তুমিও ভিজে গিয়ে—"

মেজবৌ ঈষৎ কঠিন কণ্ঠে বলেন, "কোন অভাবগ্রস্ত আমার কাছে এসে ইনিয়ে বিনিয়ে দুঃখের গাথা গাইছিল, একথা তোমায় কে বললে ?"

"বলবে আবার কে ? বুঝি না কিছু আমি ? ঘরে এসে যখনি খোঁজ করবো, শুনবো তুমি নীচের তলায় ভাঁড়ার ঘরে। ভাঁড়ার

ঘরের পিছনের ওই গলির দরজাটিই তো তোমার ভক্তজনের গতিবিধির পথ।"

"সবই যখন জানো তখন আর রাগ করে লাভ?"

মেজদাকে হঠাৎ ভারি ম্রিয়মান দেখায়। গম্ভীর ভাবে তিনি বলেন, "মানুষের জীবনটা সবটাই লাভ লোকসানের হিসেবের খাতা নয় রাধা! আমার ভাল লাগে না সমস্ত দিনের মধ্যে সামান্য যে সময়টুকু আমি ঘরে থাকি, ঠিক সেই সময়টুকুই তুমি রাজ্যের বাজে লোককে নিয়ে—"

ধীরে ধীরে কোমল হয়ে আসে মেজবৌয়ের মুখ। এইমাত্র প্রকাশ পেল যার নাম 'রাধা'।

"কোমল মুখে কোমল কণ্ঠে বলে রাধা, "রাজ্যের লোক নয় গো, একটা নেহাৎ হতভাগা এসে জুটেছে আমার ভাগ্যে অসম্ভব এক বায়না নিয়ে। তাকে আর কিছুতেই বুঝিয়ে উঠতে পারছি না।"

"অসম্ভব বায়না মানে? তোমার সুপারিশের জোরে আমাকে দিয়ে কোন জটিল কেস করিয়ে নিতে চায় না কি?"

"নাঃ তোমার কাছে তার কোন আর্জি নেই, সব আবেদনই আমার কাছে।"

মেজদা হতাশ ভাবে বলেন, "তোমার হেঁয়ালি বোঝবার ক্ষমতা আমার নেই রাধা, সে তো জানোই। সোজাসুজি বল কোন কন্যাদায়-গ্রস্ত এসে উৎপাত করছে কিনা, তাহলে কিছু দিয়ে দিচ্ছি, বিদেয় করে দিও।"

মেজবৌ এবার জোরে হেসে ওঠেন, "আমার সহজ কথাটাই যে তোমাদের কাছে হেঁয়ালি লাগে এই তো আমার জীবনের বিড়ম্বনা গো! তবু তো কত চেষ্টা করি, খুব নীরেট খুব বোকার মত কথা বলবো। সে হতভাগা কন্যাদায়গ্রস্ত নয় গো, হৃদয়দায়গ্রস্ত।"

মেজবাবু ঈষৎ চমকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একবার স্ত্রীর হাস্যোচ্ছল মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেন, তারপর বোধ করি নিজেকে রহস্যভেদে অসমর্থ

বোধেই উর্দ্ধমুখে সিগারেটের ধোঁয়াটা সীলিঙের দিকে উড়িয়ে দিয়ে উদাস সুরে বলেন, "বেশ তো, হৃদয়টা দান করে ফেলো গে তাকে।"

"আহা, আমার হৃদয়টা দান করলেই যদি" মেজবৌ রহস্যোচ্ছল কণ্ঠে বলেন, "কাজ হতো, তাহলে কি আর তোমার নির্দেশের অপেক্ষায় থাকতাম? কবেই দান করে ফেলতাম! হয়তো বা অসাবধানে অসতর্কে খানিকটা দিয়ে ফেলেওছি, কিন্তু সে হতভাগার চাহিদা অন্য। সে তোমার বোনের হৃদয় ভিখারী।"

"কী হয়েছে?" মেজবাবু খাড়া হয়ে বসেন, ক্রুদ্ধস্বরে বলেন, "সোজা করে কথা কও!"

এবার হতাশ সুরের পালা রাধার। "কথা আর কত সোজা করতে হয়, তা তো জানি না গো।"

মেজবাবু তিক্তস্বরে বলেন, "না জানো তো আমাদের মত নীরেট লোকদের সঙ্গে কথা কইতে এসো না। বেনাবনে মুক্তো ছড়িয়ে কোন লাভ নেই। আমি শুধু ভাবি মেয়েরা কত হালকা, কত অসার হতে পারে! 'আমার বোন' নিয়ে ওই সব জঘন্য রসিকতা করতে বাধেও না তোমাদের? বারণ করে দিচ্ছি রাধা, সুচেতার বিষয়ে কোন কথা কোনদিন বলতে এসো না আমায়।...যাকগে, সেদিন যে সীলমোহর করা একটা লম্বা খাম রাখতে দিলাম কোথায় সেটা?"

মেজবৌ ঠাণ্ডা সুরে বলেন,"সীলমোহর করা জিনিস আর কোথায় থাকবে? লোহার সিন্ধুকেই আছে, যেখানে সেখানে ফেলে রাখবো এত ছেলেমানুষ নই গো!"

"নও তার প্রমাণ সব সময় পাই না কি না। যাক গে দাও দিকি বার করে।"

"দিই—" আঁচলের রিঙের চাবিটা বাছতে বাছতে মেজবৌ নিরীহ সুরে বলেন, "সীলমোহর করা খামটার সন্ধানেই সন্ধ্যাবেলা ঘরে এসেছিলে বুঝতে পারছি এবার। এই নাও।"

খামটা হাতে নিয়ে শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে নীচের তলায় মক্কেল বিড়ম্বিত ঘরের দিকে প্রস্থান করেন মেজবাবু। আর মনে করতে করতে যান, রাধা খুব সাদাসিধে কথা বললেও কেন মনে হয় তার মধ্যে বুঝি অন্য অর্থ লুকোনো আছে। একী শুধু রাধার বাচনভঙ্গীর দোষ? না সত্যিই কোন অর্থ থাকে?

ভাঁড়ার ঘরের পিছনে গলির দিকের দরজাটা খুলে একধাপ সিঁড়িটায় এসে দাঁড়ালেন মেজবৌদি। এদিকটায় কেউ আসে না এ সময়। পথিক-চলা পথ নয়, বাড়িরই পিছনের ছাড়া জমিটুকু। তবু এখানে 'পথচলতি' কেউ ছিল বুঝি, রুদ্ধশ্বাস বক্ষে উত্তেজিত অপেক্ষায়। পায়চারি করছিল, মেজবৌদিকে দেখে দরজার কাছে সরে এল।

মেজবৌদির আজ আর নিজস্ব শান্ত কোমল কণ্ঠটুকু নেই, মুখ অন্ধকার কণ্ঠস্বর গম্ভীর।

"কিসের আশায় তুমি রোজ এমন করে আসো সৌরেশ? এতে তোমারও লজ্জার শেষ নেই, আমারও দুঃখের শেষ নেই।"

পথের শেষের মোড়ের বড় রাস্তার আলোটা তেরছা হয়ে এসে পড়েছে, সেই আলোয় সৌরেশের সুখে দুঃখে অবিচল চিরহাস্যোজ্জ্বল মুখটাও কেমন করুণ দেখায়। সে মাথা নীচু করে বলে, "আমার নিজের লজ্জার কথা ভাবি না মেজবৌদি, তবে আপনার দুঃখের কারণ হচ্ছি ভেবেই বিবেকের দংশন খাচ্ছি। কিন্তু এমন অদ্ভুত একটা অবস্থায় কাটাচ্ছি যে এমনটা না করেও পারছি না। আর কিছু নয় একদিনের জন্যে, মাত্র একটিবারের জন্যেই শুধু দেখা করতে চাই।"

"চাইলেই যদি পাওয়া যেত"—মেজবৌদি গম্ভীর অনুচ্চ হাসি হাসেন, "তাহলে তো পৃথিবীর সমস্ত সমস্যাই শেষ হয়ে যেত!"

"আচ্ছা, সত্যিই কি কোনদিনই সুচেতা এসময় বাড়ি থাকে না?"

"কিছুদিন থেকে অন্তুতঃ নয়। পৃথিবী উল্টে গেলেও নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না।"

"কোথায় যায় ?" হতাশ প্রশ্ন করে সৌরেশ।

"ঈশ্বর জানেন, অথবা শয়তান জানে।" তিক্তস্বর মেজবৌদির।

"আমি যে একটা কথার উত্তর চাই তার কাছে। সেটা না জানা পর্যন্ত কিছুতেই আমার শান্তি নেই মেজবৌদি !"

মেজবৌদি দরজার পাল্লাটা চেপে ধরে স্থির স্বরে বলেন, "কিন্তু অনেকদিন তো সব প্রশ্ন চুকে বুকে গেছে সৌরেশ ? আবার কেন হঠাৎ—"

সৌরেশ নীচু মাথাটা একটু তুলে একটু হেসে বলল, "আমিও আগে তাই ভেবেছিলাম মেজবৌদি, অন্তত নিজেকে বুঝিয়েছিলাম—সব চুকে বুকে গেছে, আবার কেন ? কিন্তু সেদিন যেদিন হঠাৎ আবার দেখা হল ওর সঙ্গে, বুঝলাম কিছুই চুকে বুকে যায় নি। সেই থেকে সমস্ত প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠেছে—"

মেজবৌদি বাধা দিয়ে বলে ওঠেন, "হঠাৎ কোথায় দেখা হয়েছিল ?"

"ব্যারাকপুরে—গান্ধীঘাটে—"

"ব্যারাকপুরে ! গান্ধীঘাটে ! সঙ্গে কে ছিল ওর ?" অধীর প্রশ্ন করেন মেজবৌদি।

সৌরেশ বিস্মিত হয়ে বলে, "সঙ্গে ? ছোট ছেলেমেয়েরা ছিল মনে হয়েছিল। দূরে খেলা করছিল তারা। কিন্তু ও কি সেকথা বলে নি ? আপনাকেও না ?"

মেজবৌদির মুখে একটা অনৈসর্গিক আলো ফুটে ওঠে, ছোট্ট এক-টুকরো হেসে বলেন, "সেদিন একা পেয়ে আমার ননদটির হাত ধরেছিলে ? কাঁধে হাত দিয়েছিলে ? কেমন ?"

সৌরেশ চমকে উঠে বলে, "কে বললে ?" তারপর হাসি গোপন করে বলে, "তাহলে তো বলেইছে। কিন্তু—"

"না, আমাকে কোন কিছুই বলে নি, সবই আমার অনুমান। আমার সেই অলৌকিক অনুমান প্রতিভা থেকেই এখন বুঝছি ননদটিকে আমার ঘরছাড়া করেছে কে! আদালত থেকে ছাড়পত্র দিলেই কি ছাড়া পাওয়া যায় সৌরেশ? আরও একজন কৌতুকপ্রিয় বিচারক আছেন, তাঁর কাছ থেকে ছাড়পত্র পাওয়া সোজা নয়।"

"তাই তো দেখছি! তাই তো বলছি, যে করে হোক একবার আপনি ওর সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা করে দিন। একটা কথা ওকে বলে যাই।"

মেজবৌদি মুখ টিপে হেসে বলেন, "কিন্তু আমাকে কেন বল তো? আমি কি চোর দায়ে ধরা পড়েছি?"

সৌরেশও এবার হাসে। "চোর দায়ে না হোক, কোন একটা দায়ে ধরা পড়েছেন অবশ্যই।"

"আরে চুপ চুপ!" মেজবৌদি হেসে ওঠেন। তারপর বলেন, একে তো আমার এই খিড়কি দরজায় নিত্য অভিসার, তার ওপর ওই সব ধরাপড়াপড়ি কারো কানে গেলে রক্ষে আছে? পালাও পালাও। আমি বলছি, সে হয়তো তোমারই কুটিরের আশেপাশে ঘুরছে।"

"সে কী?" চমকে ওঠে সৌরেশ, "কে বললে?"

"কেউ না, এও আমার অনুমান প্রতিভার স্বাক্ষর।"

ভিতরে এসে শুনলেন মেজবৌদি সুচেতা তখনও ফেরে নি। আর সেজকর্তা দালানে পায়চারি করে ফুঁসছেন—"আজ একটা হেস্ত-নেস্ত করতেই হবে। যার ইচ্ছে তিনি স্বাধীন হতে পারেন, ভাল কথা। কিন্তু আমাদের বাড়িতে বসে এত স্বেচ্ছাচার চলবে না।"

'চলবে না' একথা ভাইয়েরা অনেকদিন ধরেই বলছেন, শুধু মেজ-গিন্নীই তর্ক আর যুক্তির পাথর ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে সেই বিরক্তির বন্যা আটকে রেখেছেন। যদিও তাঁর যুক্তি দুর্বল—"তিনি বলেন তোমাদের

ছোট ভাইটিই বা কী? ভাই যদি যৎপরোনাস্তি স্বেচ্ছাচার চালাতে পারে, বোনই বা কেন এই সামান্য স্বাধীনতাটুকু পাবে না? দুজনেই যখন সাবালক? ব্যক্তি-স্বাধীনতা কথাটা তাহলে অর্থহীন?"

আজ মেজবৌদি সেজ দেবরের আক্রমণের আওতার দিকে এলেন না, পালিয়ে প্রাণ বাঁচালেন। সব জিনিসটা ভাল করে বোঝা দরকার হয়েছে তাঁর।

ইনটারভিউতে ডেকেছে বলেই 'চাকরী পেলাম' ভেবে উল্লসিত হবে, এতো বোকা অবশ্য সুচেতা নয়, তবু যখন চিঠিখানা এলো রক্তের মধ্যে যেন একটা মুক্তির সুর বেজে উঠলো।

তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে সাজসজ্জা সমাপ্ত করে সিঁড়িতে নামছে, সামনেই সেজবৌদি। তিনি একবার ননদিনীর আপাদমস্তক দেখে নিয়ে মুখটিপে বলেন, "কী গো আজ বুঝি দিনদুপুরেই অভিসার?"

সুচেতা আজ আর চটে উঠল না, সেও মৃদু হেসে বললো, "অবস্থা যখন চরমে ওঠে সেজবৌদি, তখন কি আর দিনদুপুর রাতদুপুর জ্ঞান থাকে?"

"তা তো বটেই! তবে ভরসার কথা, অবস্থা যখন চরমে উঠেছে, হেস্তনেস্ত একটা হবেই।"

"হ্যাঁ, সেই ভরসা নিয়েই তোমাদের ভগবানকে ডাকতে ডাকতে যাচ্ছি" —বলে পাশ কাটিয়ে দ্রুতপদে নেমে যায় সুচেতা।

কিন্তু আজ বুঝি প্রতিপদেই বাধা। ভাগ্য যে প্রসন্ন নয় বোঝাই যাচ্ছে এবার।

আর কটা সিঁড়ি নামতেই ধরলেন মেজবৌদি। "যাচ্ছিস কোথায় না খেয়ে দেয়ে?"

"খেয়েছি।"

"ওমা খেলি আবার কখন? দেখলাম না তো?"

"রাজা মহারাজার ব্যাপার তো নয় যে, ঘোষণা করে জানানো হবে, তিনি এবার ভোজনে বসেছেন।"

মেজবৌদি এ উপহাস গায়ে না মেখে উদ্বিগ্নস্বরে বলেন, "কৈ মাছের পাতুরিটা হয়ে উঠেছিল? না কি গ্রাহ্য করে দেয় নি ঠাকুর?"

"দোহাই মেজবৌদি, তোমার কৈ মাছের শোকোচ্ছ্বাস রাখো। পৃথিবীতে দিনরাত অনেক দুর্ঘটনা ঘটে থাকে, তোমার এই কৈ মাছের ব্যাপারটাও না হয় সেই তালিকায় উঠুক। এখন সরো, সরে পড়ি।"

"কিন্তু যাচ্ছিস কোথায়?"

"যাচ্ছি?" সুচেতা শেষ সিঁড়িটায় দ্রুত নেমে পড়ে বলে, "পৃথিবীতে চরে খাবার মত কোন মাঠ খালি আছে কিনা দেখতে।"

মেজবৌদি অন্যমনস্কের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবেন, দেখে মনে হচ্ছে যেন চাকরী বাকরীর চেষ্টায় চললো। তবে কি আমার অনুমান ভুল? রোজ সন্ধ্যাবেলায় যে বেরোয় সুচেতা, সে কি তবে চাকরীর চেষ্টায়? কিন্তু সন্ধ্যাবেলায় চেষ্টাই বা করতে যাবে কোথায়? তবে কি কোথায়ও কোন টিউশনি করতে যায়? নীচু ক্লাশের কোন ছাত্র-ছাত্রী জোগাড় করে? মানী মেয়ে! আর বাড়িতে সর্বদা যে ধরণের কথাবার্তা হয় বাড়িতে, তাতে এমন মনে হয় না, মানী সুচেতার মানটুকু রাখবার দায়িত্ব কারো আছে।

তবু তো সেদিনকার 'বড়দা' সম্পর্কিত ব্যাপারটা সম্বন্ধে অবহিত নন মেজবৌদি। সেটি সম্পূর্ণই সেজদম্পতির কীর্তি।

পথে বেরিয়ে সুচেতার মনে হতে লাগল, জলে স্থলে আকাশে অন্তরীক্ষে আজ যেন কী এক হালকা খুশির ছন্দ! বাস ধরবার পথটুকু হাঁটতে হাঁটতে মনের মধ্যেকার মর্মরিত হয়ে ওঠা সুরটুকুই গুঞ্জন করে ওঠে কণ্ঠে, "আমায় বাঁশীতে ডেকেছে কে, ওগো ললিতে!"

অনেকদিন আগে, যখন সুচেতা নামে একটি সুখী প্রাণোচ্ছ্বল মেয়ে গান গাইতো, তখন সে এই গানটা যখন তখন গাইতো।

কোথায় সেই বংশীধারী ? সে কী বাঁশী বাজাচ্ছে ?

চাকরী !

শুধু সামান্য একটা চাকরীর আশায় এমন মঞ্জুরিত হয়ে উঠছে সুচেতা ? তাও তেমন কিছুই নয়। একটি ছোট্ট মফস্বল জায়গায় মেয়ে স্কুলের টিচারি। মাইনেও যৎসামান্য। আই-এ ফেল টিচারকে আবার অসামান্য মাইনে দেবে কে ?

তাছাড়া—যে স্কুলের চাহিদা মাত্র 'অবশ্যই প্রবেশিকা পাশ হওয়া আবশ্যক', তাদের সঙ্গতিই বা কতটুকু ?

তবু আশার কথা, সেখানে নাকি স্কুল সংলগ্ন কোয়ার্টার্স পাওয়া যাবে।

ইনটারভিউ পেয়েছে।

তাই অকস্মাৎ এক আশায় রক্তে বেজে উঠেছে মুক্তির সুর।

স্কুলের সেক্রেটারী মাসখানেকের জন্য কলকাতায় এসেছেন, স্কুলের জন্য 'দিদিমণি' শিকারের উদ্দেশ্যে। বহুদিনের অভিজ্ঞতায় তিনি এইটুকু বুঝেছেন কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে, দরখাস্ত দিয়ে যারা একেবারে সেই মফস্বলে গিয়ে ওঠে, তারা নিতান্তই দীন নিরুপায়। তারা যখন বিচারে অনুত্তীর্ণ হয়, তখন প্রাণপণে বোঝাতে চেষ্টা করে তাদের দুরন্ত অভাবটাই তাদের কোয়ালিফিকেশান। তেমন মেয়েদের দিয়ে মেয়েদের শিক্ষা ভাল হয় না।

এ বরং কলকাতার মাটিতে বসে একেবারে দেখে শুনে বুঝেসুজে নিয়ে যাবেন। এইবেলা নিয়ে নিতে হবে। নইলে মুস্কিল আছে। বোর্ড থেকে আদেশ জারি করা হয়েছে একষট্টি সাল থেকে আর স্কুলে গ্রাজুয়েট টিচার ছাড়া চলবে না। তাহলেই আবার মাইনে বৃদ্ধির প্রশ্ন। তার চাইতে বাবা আগে থেকেই বাঁধন পোক্ত করে রাখা হোক। তাই কলকাতার ঠিকানাতেই দেখা করবার জন্য কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন।

তা এমনি আকালের বাজার যে, 'থাকা খাওয়া ও ত্রিশটি টাকার' বিনিময়ে জীবন সমর্পন করতে আমার মত মেয়ে গণ্ডায় গণ্ডায়

আসছে এই কাগজের অংশটুকু পাঠ করে। আর আসার পথে অনেকেই হয়তো সুচেতার মতই মনে মনে গেয়ে উঠেছে "আমায় বাঁশীতে ডেকেছে কে, ওগো ললিতে"—"অথবা হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে ময়ুরের মত নাচেরে।"

হোক মফস্বল, হোক সহস্র অসুবিধে, হোক মাইনের অঙ্কটা উচ্চারণের অযোগ্য, তবু তো থাকতে ঘর দেবে। সম্পূর্ণ স্বাধীন নিজের ঘর। আর সে ঘরে টিঁকে থাকবার জন্যে অবশ্যই অন্তত প্রাণধারণের মত খেতেও দেবে। লজ্জা নিবারণের জন্য রইল ওই তিরিশ টাকা!

আর কি চাই?

যে সব মেয়েরা লেখাপড়ায় তেমন অগ্রসর হতে পারে নি, অথচ চিরদিনের পরিচিত ঘর যাদের কোন না কোন কারণে দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে, তেমন মেয়ের সংখ্যা তো কম নয় বাংলা দেশে।

তবু সেক্রেটারী দামোদর গুঁই সুচেতাকে দেখেই চমকে গিয়েছিলেন বৈকি!

কদিন ধরে অনেকগুলি প্রার্থিনী দেখলেন তিনি কিন্তু এমন মহারাণীর মত মাথা উঁচু প্রার্থিনী তো কই একটিও দেখেন নি।

এ মেয়ের মাথা থেকে পা পর্যন্ত, আর চশমা থেকে জুতো পর্যন্ত, সব কিছুতেই যে রীতিমত আভিজাত্যের ছাপ সে তথ্য এক নজরেই বুঝে ফেললেন ঘুঘু লোক গুঁই মশাই।

সঙ্গে সঙ্গে এও বুঝে ফেললেন, এ পাখী খাঁচায় বসে ছোলা খাবার নয়, এ আকাশে ওড়বার পাখী। হয়তো শখের খেয়ালে দেখতে এসেছে খাঁচার দাঁড়টা কেমন জিনিস। দুদিন ছোলা ঠুকরেই শিকলি কেটে পালাবে।

বুঝে ফেললে কি হয়? লোভ বড় ভয়ানক জিনিস। ঘুঘু লোক গুঁই মশায়েরও লোভ হলো এমন একটি চকচকে ঝকঝকে সেকেণ্ড মিস্‌ট্রেস্ নিয়ে যেতে পারলে, কথায় কথায় নাক উঁচু করা হেড্ মিসট্রেসের দর্পচূর্ণ হবে নিঃসন্দেহ।

তা ছাড়া—হলেই বা গুঁই মশায়ের বয়েস বাহান্ন, আর হলেই বা স্বার্থবুদ্ধির পাকে পাকে পাক-খাওয়া ঝুনো ঘোড়েল মন, তবু তো পুরুষ!

নিজেদের সেই অকিঞ্চিৎকর বিদ্যালয়টুকু, আর তার দুর্দশাগ্রস্ত পরিবেশের মাঝখানে হঠাৎ এই রাজকীয় আবির্ভাবটি কল্পনা করে গুঁই মশাইয়ের অন্তরের অন্তঃস্থলে অবস্থিত পুরুষটির অকস্মাৎ বক্ষমাঝে চিত্ত আত্মহারা হয়ে উঠলো।

অপেক্ষা-মাত্র না করে সুচেতাকে নিয়োগপত্র দিয়ে ফেললেন গুঁই মশাই।

প্রথমটা বিশ্বাস করে নি সুচেতা।

তারপর খামেমোড়া সেই পরম সম্পদটুকু হাতে করে মনে মনে হেসে উঠল। হেসে মনে মনে বললো, 'ওহে ব্যারিস্টার সৌরেশ মিত্তির, দেখ দেখে যাও, একদা যে মেয়ে তোমার স্ত্রী বলে পরিচিত ছিল সে আজ একটা ত্রিশটাকার মাস্টারী পেয়ে ভাগ্যকে বিশ্বাস করতে পারছে না।'

তারপর গুঁই মশাইকে হাত তুলে নমস্কার করে কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয় জেনে নিয়ে, এবং যাত্রার দিন ধার্য করে ফেলে ফিরে এলো।

এলো, কিন্তু আসার সময়কার মতো হালকা ভাবটাকে আর ফিরে পেল না। সমস্ত মনটা যেন কী এক গ্লানিতে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। যতবার গুঁই মশাইয়ের চেহারা আর কথাবার্তার অমার্জিত ভঙ্গীটা মনে পড়ে যাচ্ছে, ততবারই মন বিদ্রোহী হয়ে উঠতে চাইছে।…কিন্তু না, এ মনকে প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না। মন নিয়ে লীলাখেলা শেষ হোক তোমার সুচেতা, ঘুমন্ত পুরীর রাজকন্যা তুমি নও যে শুধু সোনার খাটে গা মেলে স্বপ্ন দেখবে। হয়তো শুধু যদি ঘুমন্ত হয়ে স্বপ্নই দেখ, ভাগ্যে সোনার খাটখানা বজায় থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু সেই আশ্রয়ই কি তোমার কাম্য?

পৃথিবীর ধূলিধূসর রুক্ষপথে নেমে এসো কন্যা, সেই 'ঘর'কেই পরম সম্পদ বলে মেনে নাও যে ঘর তোমার স্বোপার্জিত।

সেখানে দাসত্ব আছে, কিন্তু সে দাসত্ব অগৌরবের নয়। অর্থ আর সামর্থ্য এই দুটো জিনিস নিয়েই তো জগতের দাঁড়িপাল্লাখানা ভারসাম্য রক্ষা করে চলেছে। একের অর্থ অপরের সামর্থ্য, এই চাপানো হচ্ছে সেই তুলাদণ্ডের এ পাল্লায় আর ও পাল্লায়। এতে অগৌরব নেই।

ফেরার সময় ভাবলো সুচেতা, দিদির বাড়িটা একবার ঘুরে গেলে কেমন হয়? বহুকাল যায় নি সেখানে। আর দিদিও যেন অনেক দিন আসে নি মনে হচ্ছে। দিদি জামাইবাবুর অদর্শনে খুব যে কাতর ছিল তা নয়, এতদিন তো মনেই পড়ে নি, তবে আজকে মনের মধ্যে 'বিজয়ার' সুর।

মনে হচ্ছে—'যাবার বেলা বিদায় দেহ ভাই, সবারে আমি প্রণাম করে যাই।'

দিদির বাড়িটা মনে পড়লো, মনে পড়লো দু-এক জন সহপাঠিনীকে। যাদের আজও বিয়ে হয় নি। তবু তাদের কাছে যেতে মন সরলো না। খুব একটা ভাল কাজ যোগাড় করে যদি চলে যেতে পারতো সুচেতা, তা হলে বড় মুখ করে বিদায় নিতে যাওয়া চলতো। সব থেকে লজ্জা তো সহপাঠিনীদের কাছেই। তাদের কাছে গিয়ে কি করে বলবে "আমি পরাজিত! আমি ভাগ্যের হাতের মার খেয়ে স্বেচ্ছায় নির্বাসন দণ্ড মাথায় তুলে নিচ্ছি। আমি বিতাড়িত হয়ে চলে যাচ্ছি পরিচিত জগৎ থেকে।"

না, ওদের কাছে যাওয়া যায় না।

কিন্তু আর একটা জায়গায়? আর এক জনের কাছে?

এই পরাজয়ের গ্লানিটা দিয়েই যাকে অনেক বেশী পরাজিত করা যায়! যাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে যেতে পারা যায়, 'দেখ, তোমার কৃতকর্মের ফল দেখ।'

ভাবতে গিয়ে বুকের রক্ত উত্তাল হয়ে ওঠে।

কিছুতেই বুঝতে পারা যায় না, সেই বিদায় নিতে যাওয়াটা তাকে লজ্জা দেওয়া, না নিজেই ভাস করে লজ্জার কালি গায়ে মাখা।

থাক্ ও সব গোলমেলে দুঃসাহসে, তার চাইতে দিদির বাড়িই ভালো।

জগদীশ গম্ভীর হাস্যে সম্বোধন করলেন, "কী ব্যাপার! ছোট শালা যে? পথ ভুলে নাকি? না এই অধমকে দিয়ে নতুন কোন কেস করবার দরকার পড়েছে?"

আরক্ত হয়ে উঠল সুচেতার দুই কান, তবু মুখে হাসি বজায় রেখে বললো, "নাঃ। আর আপনাদের ফাঁদে পা দেবার বাসনা নেই।"

"তাই বুঝি! ফাঁদটা তাহলে আমাদেরই?"

কান লাল হয়ে ওঠে জগদীশেরও। সুচেতা সে দিকে দৃকপাত না করে সমান হাসি মুখে বলে, "সেটা তো বলাই বাহুল্য। শাস্ত্রেই আছে বাঘে ছোঁওয়াও যা, উকিলে ছোঁওয়াও তা, কিন্তু দিদি কোথায়? দেখছি না যে?"

জগদীশ মুখের সামনে একটা বই খুলে ধরে শ্লেষের সুরে বলেন, "তোমার দিদি তো তোমার মতন বাইরের ঘরের জীব নয়? আছেন বাড়ির মধ্যে কোথাও। হয়তো বা রান্নাঘরের গরমে স্বামী-পুত্রের জন্যে ব্যস্ত হয়ে খাবার করতেই লেগে আছেন।"

সুচেতা এ শ্লেষ গায়ে না মেখে নিজেও ব্যঙ্গের সুরে বলে, "আমিও তাই আন্দাজ করছিলাম। সত্যি, দিদির পায়ের ধুলোর এক কণাও যদি পেতাম!"

"পেলে বর্তেই যেতে সুচেতা, তাতে ব্যঙ্গের কিছু নেই।" বলে জগদীশ এবার বইয়ের পৃষ্ঠায় পুরোপুরিই মনঃসংযোগ করেন।

সুচেতার ইচ্ছা হল ধুলোপায়েই চলে যায়।

কীই বা হবে ভিতরে গিয়ে? সেখানেও তো এমনি শীতল অভ্যর্থনা জুটবে! তবু চলে যেতে পারলো না। শোভনতায় বাধলো।

সুজাতাও সত্যিই যেন পতিব্রতা সতী, যেন পতির প্রতিধ্বনি। তিনিও বললেন, "কি খবর? সুচেতা যে? পথ ভুলে নাকি?"

"কথাটা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড হয়ে গেল দিদি!" বসে পড়ে বললো সুচেতা, "সত্যি তোমরা দু'জনে একাত্ম!"

সুজাতা গম্ভীরমুখে বলে, "সেইটুকু হতে পেরেছিলাম বলেই আজও লোকসমাজে মুখ তুলে দশের একজন হয়ে টিঁকে আছি। কিন্তু তুই কি আমরা 'একাত্ম' এই খবরটুকু দিতেই এত কষ্ট করে এলি?"

সুচেতা হেসে উঠে বলে, "প্রায় তাই! তবে বাড়তি খবর একটু আছে। চলে যাচ্ছি তোমাদের সমাজ থেকে।"

"চলে যাচ্ছিস? চলে যাচ্ছিস মানে?" সুজাতা একটু ভয়ে ভয়ে তাকাল, কী রে বাবা, আত্মহত্যার সংকল্প টংকল্প করে নি তো? যে মেয়ে, বিশ্বাস কি!

সুচেতা বলে ওঠে, "না না চমকাবার দরকার নেই দিদি, এমন কিছু চমকপ্রদ খবর নয়। চলে যাচ্ছি চাকরী নিয়ে। মানে একটা মফস্বল স্কুলের দিদিমণি হয়ে।"

"মফস্বল স্কুলে? মানে বিদেশে?"

সুজাতা তীক্ষ্ণ প্রশ্ন করেন।

"বিদেশ আর কি! বাংলা দেশেই। শক্তিগড় বলে জায়গা আছে জানো?"

"নাম শুনে থাকবো।" সুজাতা বিরক্তভাবে বলেন, "সেখানে যাচ্ছ মাস্টারী করতে? একা?"

"তা দোকা আর কোথায় পাবো?" সুচেতার মুখে একটু বিষণ্ণ হাসি ফুটে ওঠে। সুজাতা হঠাৎ একটু নরম হয়ে পড়েন। বোধ করি ছোনবোনটির জন্যে পুরনো কালের একবিন্দু স্নেহ গলে বেরিয়ে আসে তাঁর আঁটসাঁট প্রাণের কোনো একটু অসতর্ক ছিদ্র দিয়ে।

বোনকে জেরার পর জেরা করতে থাকেন সুজাতা, বিরক্তি-কুটিল কণ্ঠে নয়, ক্ষোভের সুরে। শেষ পর্যন্ত কাছে বসিয়ে যত্ন করে

খাওয়ানও। এবং আরো শেষে বেরিয়ে আসার সময় একশোবার বলা কথাটা আর একবার বলেন, "সই করেছিস তো বয়ে গেছে! কথাতেই বলে, 'ভারি তো বিয়ে তার দুপায়ে আলতা!' এও সেই তাই। ভারি তো চাকরী, তার আবার কথা দেওয়া! বলে দে—বাড়ি থেকে বারণ করেছে, যেতে পারবো না।"

সুচেতা হাসে।

"হাসছিস্ মানে?"—সুজাতা ফের চেপে ধরেন, "ত্রিশ চল্লিশ টাকার নীচে একখানা শাড়ি কখনো পরিস নি তুই, আর তুই যাবি ত্রিশ টাকার একটা মাস্টারী করতে অখদ্যে কোথাকার এক ইস্কুলে? বুঝেছি আমি, বাড়িতে তোর জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল তাই অভিমান করে—কিন্তু কেনই বা তোর এত জেদ সু? আমার কাছে থাকলেই কি তোর জাত যাবে? বেশ তো মাস্টারী করতে চাস তো আমার মেয়ে ছেলেদেরই কর? খাওয়া থাকা আর পঞ্চাশ টাকা মাইনে দিচ্ছি তো একটা মাস্টারকে ছেলে মেয়ে দুটোর জন্যে। সেটা না হয় তোকেই দেব। ঢের মানের সঙ্গে থাকবি।"

এরপর, এ প্রস্তাবের পর, আর দিদির উপর রাগও আসে না সুচেতার, বরং করুণা হয়। স্বামীগতপ্রাণা হতে হতে মানুষটা একেবারে চিনির পুতুলের মত গলেই গেছে। নইলে এত বোকা কি আগে ছিল?

আহা, তবু বোঝা যাচ্ছে দিদি তাকে এখনো ভিতরে ভিতরে ভালবাসে। ভালবাসার ধরণটা সুজাতার নিজের বুদ্ধির অনুযায়ী বলেই হয়তো সে ভালবাসা সুচেতার কোন কাজে লাগছে না, তবু বাসে তো!

কেজানে! কোথায় চাপা পড়ে থাকে এই সব ভালবাসা? চলে যাবার সময় হয়তো বা দেখবে সেজদাও তাকে ভালবাসেন! কিছুই আশ্চর্য নয়!

আর সেই আর একটা লোক!

একদা যার ভালবাসার সমুদ্রের কূলকিনারা ছিল না, আর একদা সেই সমুদ্র যার নিঃশেষে শুকিয়ে গিয়ে মরুভূমির বালুতে মুখ লুকিয়েছে !

ব্যারাকপুরের গঙ্গার ঘাটের সেই ছবিটা এখন যেন আর সত্যি বলে মনে হয় না। মনে হয় স্বপ্ন, মনে হয় কল্পনা !

বৃষ্টি পড়ছিল শেষরাত থেকে। প্রচণ্ড বৃষ্টি। অনেকদিন আগে একটা সন্ধ্যায় যেমন পড়েছিল। নিদ্রাতুর সৌরেশ চোখ খুলে দেখে পাশ ফিরে আর একবার ঘুমিয়েছে, সহসা ঘুম ভাঙলো ভৃত্য সাধুচরণের ডাকে।

"বাবু বাবু, একটা লোক আপনাকে ডাকছে।"

'এমন সময় ডাকছে !'

সৌরেশ গায়ের ঢাকাটা খুলে ফেলে দিয়ে উঠে বসে অবাক হয়ে বলে, "এমন সময় ডাকছে কি রে ? কি রকম লোক ?"

"আজ্ঞে বাবু ভদ্দরলোক বলেই মনে হচ্ছে। খুব বিপদগ্রস্ত মনে হচ্ছে। নীচের তলা থেকে দোতলায় উঠতে চাইছে না। তাতেই মনে হচ্ছে—"

"হুঁ। তোর মনে তো অনেক কিছুই হয়। বলছে কি ?"

"কিছু না। শুধু বলছে—'বাবু আমায় দেখলেই বুঝতে পারবেন।' মনে হচ্ছে বাড়িতে কেউ মারা গেছে বাবু ! পা খালি, চেহারা দুঃখু দুঃখু।"

"নাঃ। তোর 'মনে হওয়ার' জন্যেই তোকে লাটের অফিসে চাকরী দেওয়া উচিত"—বলে রাত্রিবাসের উপর একটা আচ্ছাদন চাপাতে চাপাতে নীচে নেমে যায় সৌরেশ। আর নেমেই সিঁড়ির মুখে আগন্তুক ছোকরাকে দেখে চমকে যায়। বোধ করি "কি রে ?" বলে চেঁচিয়েও ওঠে। ছোকরাও সৌরেশকে দেখেই হাউ

মাউ করে ওঠে, "বিপদ ঘটেছে সুরোকাকা, বাবা হঠাৎ হার্টফেল করেছেন।"

আকস্মিক খবর, তবু বুঝি অপ্রত্যাশিত নয়। এমনি সহসাই এ খবর আসবে, এটাই যেন নিশ্চিত ছিল। সিঁড়ির একটা ধাপে বসে পড়ে বলে সৌরেশ, "কখন?"

"এই, রাত দুটো আড়াইটে হবে। ঘুম টুম তো বিশেষ ছিল না, রোজ যেমন সামান্য একঘুম ঘুমিয়ে দালানে বারান্দায় পায়চারি করে বেড়ান তেমনিই বেড়াচ্ছিলেন, হঠাৎ মাকে ডেকে খাবার জল চেয়েছেন, মা উঠে গিয়ে জল এনে দেখেন ব্যস!"

হয়তো আকারণ প্রশ্নই, তবু প্রশ্ন করে সৌরেশ, "শোবার আগে বা খাওয়া দাওয়ার সময় কিছু বলেন নি? মানে, শরীর খারাপ টারাপ?"

"শরীর তো এমনিতে খারাপই, তবে বিশেষ করে কিছু বলেন নি।"

সৌরেশ একটা নিশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, "চল্।" মনে করতে চেষ্টা করলো যে লোকটাকে আর কোন দিন দেখতে পাবে না, কবে শেষ দেখেছে তাকে?

আর এমনি বিচিত্র মন মানুষের যে, মদ খেয়ে খেয়ে লিভার পচে মারা গেল যে লোকটা, তাকেই আর একদিন আগ্রহ করে ডেকে মদ খাওয়ানো হয় নি বলে ক্ষোভে আক্ষেপে ব্যাকুল হয়ে উঠতে লাগলো শিক্ষিত, সভ্য, 'বুদ্ধিমান' বলে খ্যাত সৌরেশ মিত্তির।

বড়দা তাঁর তিনতলার তপস্যাগুহ থেকে আরও একবার ডেকে পাঠালেন। আজ আর চেঁচামেচি নয়, থমথমে মুখে বললেন, "তুমি তাহলে একেবারে সংকল্প স্থির করে ফেলেছ?"

সুচেতা মাথা নীচু করে বললো, "হ্যাঁ।"

"এর চাইতে ভাল কিছু জুটলো না ?"

"কই আর ?"

"আর কিছুদিন ধৈর্য ধরে দেখা কি একেবারেই অসম্ভব হয়ে উঠেছিল ?"

সুচেতা অবশ্য নীরব !

"বেশ ঠিক আছে। তোমার কাছে আর বংশের গৌরব বা বাড়ির মাথা হেঁটের কথা তুলবো না, এখন বুঝতে পারছি, তুমি আমাদের মাথা হেঁট করতেই বদ্ধ পরিকর। আচ্ছা যাও। ইচ্ছে হয় তো পৌঁছনো খবর দিও।"

সুচেতা গরম কান আর লাল লাল মুখ নিয়ে দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে দালান থেকে সিঁড়িতে নামতে গিয়ে অসতর্কে আর একবার মুখ ফিরিয়ে দেখেই থমকে দাঁড়ালো। মুহূর্তকাল, কিন্তু যেন অনাদি অনন্তকাল ! এই মুহূর্তটুকুর মধ্যেই নির্দ্ধারণ করে নিতে হবে বাকী ভবিষ্যৎ !

কিন্তু যাবার বেলায় এরা এমন 'বাঁধন বাঁধন' খেলা খেলছে কেন ? সুচেতাকে দুর্বল করে দেবার জন্যে ? তবু না না ! কিছুতেই দুর্বল হয়ে পড়বে না সুচেতা। বড়দা জামার হাতাটা তুলে চোখ মুছতে থাকলেও না।

সেজদা ডেকে কথা বলছেন না, নৈর্ব্যক্তিকভাবে খুব আস্ফালন করে বেড়াচ্ছেন, মাস্টারী করতে যাচ্ছেন মফস্বলের ইস্কুলে ! রুচি বটে একখানা ! এর চাইতে এখানে থেকে 'দালদা'র ক্যানভাসিং করলেই চলতো ! তাতে বরং আর দু-পাঁচ টাকা মাইনে বেশী পাওয়া যেত ! যাক যান না, শখ মিটিয়ে আসুন বাছাধন ! ঘুঘুই দেখেছেন, ফাঁদ তো দেখেন নি ! গিয়ে দেখবেন এখন ওখানের 'কোয়ার্টার্স' মানে কি ! স্রেফ ইস্কুল বাড়ির গোয়াল ! আর কিছু নয়। আমি এই বলে দিচ্ছি দেখুক গিয়ে। ও সব জায়গায় ইস্কুল বাড়িতে অমন গরুটরু পোষে। তারপর শুধু মেয়ে পড়ালেই কি

ডিউটি শেষ হবে না কি? গরুগুলোকে ঘাস বিচিলি দিতে হবে, ইস্কুল ঝাড়ু দিতে হবে, দরকার পড়লে হেড্ মিস্‌ট্রেসের বাড়িতে রান্না করেও দিয়ে আসতে হবে। হুঁঃ! মফস্বলের মেয়েস্কুল, তার আবার বোর্ডিং, তার আবার কোয়ার্টার্স!···ঠিকানাটা ভাল করে জানিয়ে যায় যেন, রোগে পড়লে তো এই অধমাধম দাদাদেরই ছুটতে হবে ঘাড়ে করে ফিরিয়ে আনতে!"

সেজবৌ চাপাগলায় উগ্র মন্তব্য করে, 'হ্যাঁ, তোমার ভরসায় বসে থাকবে! তোমরা যেমন ন্যাকা, তাই বোন যা বোঝাচ্ছে, তাই বুঝছো! ও যাবে তিরিশ টাকা মাইনের চাকরী করতে! বলে ওর একজোড়া জুতোর দাম তিরিশ টাকা! এসব ষড়যন্ত্র গো ষড়যন্ত্র! নেহাৎ বাড়ি থেকে পাঁচজনের নাকের সামনে দিয়ে চলে যাবে? তাই ফন্দিফিকির করে সামনে থেকে সরে পড়বার ব্যবস্থাটি করে নিচ্ছে। তারপর যা করবে, সে তোমরা দেখতেই পাবে।"

ঠিক এ ধরণের কথাটা বোধ করি সেজকর্তার মনে লাগে না, তাই চড়াগলায় স্ত্রীর কথার উত্তর দেন, "তা আশ্চর্য কি, মেয়ে মানুষ বৈ তো নয়।"

সেজবৌ ক্রুদ্ধগলায় বলে, "মেয়েমানুষ বলে হেনস্থা মানে? সব মেয়েমানুষ সমান? মেয়েমানুষ তোমার মা ঠাকুমাও—"

"খবরদার, মুখ সামলে—" বাঘের মত গর্জন করে ওঠেন সেজকর্তা।

"কেন, কি জন্যে? মুখ সামলে চলুক তারা, যারা অন্যের দয়ায় পড়ে থাকে। আমি মুখ সামলে চলবো কিসের জন্যে?" সেজবৌ যেন ফেটে পড়ে।

আক্রমণের গতি পরিবর্তিত হয়ে যায়, সুচেতাকে ছেড়ে এবার ওরা পরস্পরকে আক্রমণ করতে শুরু করে—যা তাদের দাম্পত্য-জীবনের প্রায় সারা জীবনাবধিই করে আসছে।

মেজদা যে কারণেই হোক একেবারে নির্বাক। মেজবৌদিও প্রায় তাই। শুধু কর্তব্যবশেই সৌরেশের গোপন অভিসার, আর তার একান্ত প্রার্থনার বার্তাটুকু জানিয়েছিলেন সুচেতাকে। শুনে সুচেতা প্রথমটায় একেবারে বিচলিত হয়ে পড়েছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে সামলে নিল নিজেকে। সামলে নিয়ে বললো, "তোমরাই তো বলো মেজবৌদি, 'ছেঁড়াচুল খোঁপায় ফিরে আসে না, তবে আর এসব বোকামী কেন ?"

"কেন সেকথা আমিই বা বুঝবো কি করে ? তবু মনে হয় একবার দেখা করলে ঘোরতর কিছু ক্ষতি হয়েও যেত না।"

"লাভও কিছু হতো না। যা সম্পূর্ণ শেষ হয়ে গেছে, তার আবার জের টানা কেন ?"—বললো সুচেতা তুই হাত জোড় করে, "তোমার প্রাক্তন ঠাকুরজামাইটির সঙ্গে আবার যদি কোনদিন দেখা হয় তো বোলো তাঁকে, এ সব তাঁরই প্রাক্তনের ফল।"

মেজবৌদি চুপ করে গিয়েছিলেন।

বাড়িতে কত কথার ঢেউ, সুচেতা নির্বিকার।

ও যেন দৃঢ় সংকল্প করেছে যাবার বেলায় সবাইকে ক্ষমা করে যাবে। তারপর অনিশ্চিত অজানা পথে পা বাড়িয়ে এগিয়ে দেখবে ভাগ্য তার জন্যে কী নিয়ে অপেক্ষা করছে।

আগামী কাল যাত্রা। যাত্রার প্রস্তুতি, তাও যৎসামান্য।

সুচেতার বসনভূষণ ভার তো সোজা নয় ! মাত্র তার স্বল্পতম অংশ নিয়ে মাঝারি তুটো সুটকেসে ভরে ফেলে টুকিটাকি তু-একটা জিনিস কিনতে বেরোতে যাচ্ছে, দরজার কাছে ছোড়দার সঙ্গে প্রায় ধাক্কা। এই কদিন সুচেতা নিজেকে এমন গুটিয়ে রেখেছিল যে ছোড়দার সঙ্গে দেখাই হয় নি।

ছোড়দা ওকে দেখেই হৈ হৈ করে উঠলো, "এই যে স্বাবলম্বিনী মহিলা ! কোথায় যাওয়া হচ্ছে ? চুন কিনতে ?"

"চুন!"

সুচেতা হাঁ করে বলে "চুন মানে?"

"চুন মানে চুন! শুভ্র সুন্দর স্নিগ্ধ কোমল। পান সাজার পাট তো বাড়িতে নেই, কাজেই দরকারের সময় কিনেই নিতে হবে। তবে কালি জিনিসটা বোধ হয় বাড়িতে মিলবে।"

সুচেতা সত্যই অবাক হয়। কি সব বলছে! আর চকিতে মনে পড়ে যায় সৌরেশের কথা! তবে কি ছোড়দা ঠিক স্বাভাবিক অবস্থায় নেই? তাই কি সম্ভব? এই সকালবেলা!

ছোড়দা ওর বিমূঢ় অবস্থা দেখে প্রায় মাতালের ভঙ্গীতেই হেসে ওঠে। তারপর বলে, "কি? কথাটা বুঝতে কষ্ট হচ্ছে? বলছিলাম চাকরী করতে যাবার আগে এই পাপিষ্ঠ পামর দাদাদের এক গালে কালি আর এক গালে চূণ মাখিয়ে দিয়ে যেতে হবে তো?"

সুচেতা আজ হঠাৎ ক্ষমার প্রতিজ্ঞা ভুলে যায়। লোহার গেটটায় ঠেশ দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে তীক্ষ্নস্বরে বলে ওঠে, "আমার চাকরী করাটা তোমাদের গালে চূণ কালির পর্যায়ে পড়ে কোন সূত্রে?"

ছোড়দা সহসা গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলে, "বুদ্ধি থাকলে বুঝতে কোন সূত্রে। জন্মসূত্র বলেও একটা শব্দ আছে কি না?"

"জন্মসূত্র!" হঠাৎ খিলখিল করে হেসে ওঠে সুচেতা, হাসতে থাকে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে যে রকম হাসিটা প্রায় অশোভন, তেমনি করে।

"পাগলের মত হাসছিস যে?" ছোড়দা বলে।

"হাসছি তোমার ওই ভয়ঙ্কর মজাদার কথাটায়। কি বললে যেন—'জন্মসূত্র?' ও শব্দটা তোমরা জানো? তোমরাও জন্মসূত্রের দাবীতে বিশ্বাসী?"

ছোড়দা একটু থেমে সুচেতার উত্তেজিত মুখের দিকে একবার তাকিয়ে আস্তে বলে, 'আমি রীতিমতই বিশ্বাসী। কিন্তু আমার কি করবার আছে বল? এ সংসারে আমার অবস্থা তোর চাইতে খুব

একটা উঁচুদরের নয়, তবে আমি কিছু কেয়ার করি না। মন্দ আর কি আছি? খাইদাই, এক পাশে পড়ে থাকি। যা প্রাণ চায় বাইরে বাইরে করি, মাসের মধ্যে দু-চার দিনের বেশী দেখাই হয় না পূজ্যপাদ দাদাদের সঙ্গে। না হোক, কী এসে যাচ্ছে? বাড়িটা বাবার তৈরি, কাজেই তাড়িয়ে দিতে তো আর পারবে না?"

সুচেতা এক ঝলক তিক্ত হাসি হেসে বলে, "ওই, ওইটুকু তফাৎ তোমার সঙ্গে আমার! তোমায় যা পারে না, আমায় তা পারে। তোমার বাবার বাড়ি থেকে তোমাকে তাড়িয়ে দেবার ক্ষমতা কারুর নেই—তুমি মদ খেয়ে মাতলামি করলে নয়, তুমি উচ্ছন্ন গেলে নয়, তুমি সামাজিক কোন বিধিব্যবস্থা না মানলেও নয়! আমাকে আমার বাবার বাড়ি থেকে 'দূর হও' বলবার ক্ষমতা বাড়ির মাছি মশাটির পর্যন্ত আছে। এবং সেই বিধিব্যবস্থার পানটি থেকে চুনটি খসার জন্যে বলতে বাধেও নি। তবু জন্মসূত্রের দায়ে, তোমাদের ষোল আনা মানসম্ভ্রম বজায় রাখবার দায়টা পোহাতে হবে আমাকেই, কেমন?"

ছোড়দা ঈষৎ সন্দিগ্ধভাবে বলে, "কিন্তু এতটাই কি ঠিক? আমার বিশ্বাস এ তোর চিরকেলে অভিমানী স্বভাবের কল্পনার বিলাস। বড়দার কথা যদিও বাদ দিই, মেজবৌদি থাকতে বাড়িতে এতবড় অঘটন হওয়াটা অবশ্যই সম্ভব নয়।"

"জগতে সম্ভব অসম্ভবের কোন সীমারেখা নেই ছোড়দা! এমন ঘটনাও কি তুমি দেখ নি কখনো, ছেলে মাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, বাড়িটা তার বাবার বলে? পুরুষের ক্ষেত্রে জন্মসূত্রটা বড়ই প্রবল ছোড়দা, মেয়েদের ক্ষেত্রে কানাকড়াও নয়। যদি বা কোন সমাজে বা কোন নতুন আইনে মেয়েদের পক্ষে জন্মসূত্র মানাও হয়, তবু তার মধ্যে 'কৃপার' ভাবটাই স্পষ্ট হয়ে বাজে না কি? ভাগ পেলেও ভাগের মধ্যে কি সমতা থাকে?"

"মেয়েরা তো তেমনি স্বামীর সংসারের ভাগটা ষোলো-আনা পাচ্ছে! সেখান থেকে—"ছোড়দা হেসে, ওঠে, "কি বলে ওই

স্বামীর মা, বোনকে উচ্ছেদ করবার ষোলো আনা অধিকার তো দেওয়া হয়েছে তাকে !"

"তা বটে !" সুচেতাও হেসে ফেলে, "তাই জন্যেই তো মেয়েরা উঠে পড়ে লেগে সেই অধিকারের সদ্ব্যবহার করে। কিন্তু খুব একটা উন্নত ব্যবস্থা কি সেটা ? তাছাড়া—যে অধিকারের বলে উচ্ছেদের স্বাধীনতা, সে অধিকারটাও তো আজ ভঙ্গুর করে দিলে তোমরা ! আমাদের এই পবিত্র হিন্দু বিবাহের সেই গীতায় কথিত 'আত্মা'র অবস্থার মত 'নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রানি, নৈনং দহতি পাবকঃ' অবস্থা তো আর রইল না ? নিজেরাই কখন উচ্ছেদিত হবে, এই ভাবনা নিয়ে তো বসবাস !"

"ওরে সর্বনাশ ! এ যে রীতিমত সমাজতাত্ত্বিক লেকচার ! মাঠে নেমে পড়গে যা সু ! কোন এক পক্ষ নিশ্চয়ই লুফে নেবে তোকে !"

"গোল্লায় যাও তুমি !" বলে সুচেতা আবার বেরোবার জন্যে গতি নেয়।

কিন্তু ছোড়দার বিকারমাত্র নেই। "তুই তো আজন্মকাল আমাকে গোল্লায় যাবার পরামর্শ দিলি। খুব সম্ভব তোর ইচ্ছাশক্তির বলেই আমার এই গোল্লার পথে গতি !" বলে হেসে ওঠে সে। তারপর কি ভেবে "চল তোর চুন কেনার সাহায্য করিগে " বলে সুচেতার সঙ্গেই পাশাপাশি পথ চলতে থাকে।

"তোমার আবার আসবার কী দরকার ?" সুচেতা বলে ঘাড় ফিরিয়ে।

ছোড়দা প্যান্টের দুই পকেটে দুই হাত ভরে অলসভাবে এগোতে এগোতে বলে, "রাস্তাটা খুব সম্ভব তোর কেনা নয় ."

"কিন্তু ছোড়দা" সুচেতা দৃঢ়ভাবে বলে, "দোহাই তোমার, যাত্রা-কালে যেন আবার কিছু উপহার টুপহার দিয়ে বোসো না। তোমার গতিভঙ্গীটা সন্দেহ জনক।"

"উপহার ! তোকে ? দায় পড়ে নি তো আমার !"

"তা উপহার দেবার মত লোক একটা জোগাড়ই বা করছো না কেন ?" হাসে সুচেতা।

"দূর দূর !" ছোড়দা হেসে ওঠে, "আমারও তো অনেক গুণ ! শেষে আবার বৌ ডাইভোর্স স্যুট আনুক। এ বাবা বেশ আছি।"

"হুঁ ! কিন্তু মুস্কিল কি জানো ছোড়দা, ওই ভাবে 'বেশ থাকা'র স্বাধীনতাটা আমাদের ভাগ্যে নেই, সেখানে তোমরা আমাদের মেরে রেখেছ। আমাদের জীবনটা অসহ্য বোধ হলেই প্রতিকারের পথ খুঁজতে হয়।"

কথা বলতে বলতে ওরা ওদের পাড়ার চিরপরিচিত স্টেশনারি দোকানটায় এসে পড়েছে। সুচেতা অবশ্য আজকাল পরিচিত সমাজে কমই আসে, হয়তো অন্যত্র যেতো, ছোড়দা কিন্তু দাঁড়িয়ে পড়েছে।

"কী তোর দরকার ছিল যেন, চুন না কালি, নে কিনে।"

"নাঃ এখানে নয়।" চাপাগলায় বলে সুচেতা।

"এখানে নয় ? ওঃ শাড়ি টাড়ি কেনার ব্যাপার ?"

"শাড়ি নয় বাবা, স্টেশনারিই ছু-চারটে, কিন্তু এ দোকানে নয়।"

"ওঃ ! 'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোনখানে।' আচ্ছা চল্।"

"কিন্তু তুমি কেন মিথ্যে সময় নষ্ট করছো ছোড়দা, আমি তো কিনিই নিজে।"

"কিনলেই বা, একদিন নয় অপরের কিছু পরামর্শই নিলি !"

অগত্যা বেশ খানিকদূর এগিয়ে আর একটা দোকানে এসে পড়ে ওরা।

সুচেতা কেনে এটা ওটা পাঁচটা প্রয়োজনীয় জিনিস। ধরে নিয়েছে, যেখানে যাচ্ছে সেখানে এসব কিছু মেলে না। টাকা পঁচিশের মত দাম হলো। এইগুলো নিয়ে তো চলুক সুচেতা; তারপর আছে ত্রিশ টাকার নৌকো।

দাম দেবার সময় ছোড়দা প্যান্টের পকেট থেকে পার্স বার করছে দেখেই সুচেতা ভুরু কুঁচকে চাপাগলায় ধমকে ওঠে, "ছোড়দা !"

ছোড়দাও ভুরু কুঁচকে চাপাগলায় বলে, "থামো! একটি দৃশ্যের অবতারণা কোর না!"

"আচ্ছা, চলো না বাইরে!" আরও চাপাগলায় বলে সুচেতা। প্যাকেট গুলো গুছিয়ে সামলে হাতে করছে তখন ছোড়দা।

বাইরে বেরিয়ে এসে সুচেতা গম্ভীরভাবে বটুয়া থেকে টাকা বার করে এগিয়ে ধরে বলে, "এই নাও।"

ছোড়দা একবার টাকাটার দিকে তাকিয়ে একটু চুপ করে থাকে, তারপর ওর স্বভাব-বহির্ভূত একটু বিষণ্ণ হাসি হেসে বলে, "সময় কতো দ্রুত ছোটে দেখ সু! মনে হচ্ছে যেন এই সেদিনের কথা, যখন তুই আমার সঙ্গে দোকানে আসবার জন্যে একশোবার আমার তুটি পায়ে পড়তিস্, আর দোকানে এসে আমার পকেটের ওজন সম্বন্ধে চিন্তামাত্র না করে যথেচ্ছ শৌখিন দ্রব্যের বায়না করতিস!"

হঠাৎ সুচেতা ঘাড়টা বাঁকিয়ে মুখটা ফিরিয়ে নেয়, তারপর একটু পরে গলা ঝেড়ে খুব আস্তে বলে, "তখন 'বোধ' ছিল না তাই। এখন তোমার পকেটের ওজনটা সম্বন্ধে বোধটা তেমন অবোধের কোঠায় নেই যে!"

"তা বটে! আমিও তাই ভেবে দেখেছি সু, বোধ জিনিসটাই সকল তুঃখের মূল। অবোধ হওয়ার মত আনন্দ আর নেই। তাই তো অবোধের ভানে সর্বদা দাদাদের মোটরে ঘুরে বেড়াই, দাদাদের পয়সায় এবেলা ওবেলা গ্যাবার্ডিনের স্যুট ভেঙে পরি, দামী জিনিস ছাড়া ব্যবহার করতে পারি না, শৌখিন ডিশ ছাড়া খেতে পারি নে। আর নিজে সামান্য যা রোজগার করি, তুহাতে ওড়াই। পকেট সত্যিই সব সময় হালকা, কিন্তু ওটা থাক সুচেতা, ওটা নিতে হলে আমাকে আবার দাদাদের পয়সায় ট্যাক্সি ভাড়া করে বাড়ি ফিরতে হবে, হাঁটতে পা উঠবে না।"

আবার ঘাড় ফিরিয়ে দ্রুত হাঁটতে থাকে সুচেতা।

কিন্তু বাড়ির পথে নয়। একটু চলে বলে, "একটা কাজ করতে পারো ছোড়দা?"

"কি ?"

"ওগুলো বয়ে নিয়ে যাবার ভার নিতে পারো ?"

"বয়ে ?"

"হ্যাঁ তুমি তো বাড়িই যাচ্ছ। আমি তাহলে আর একটু ঘুরে যাই।"

"তা বেশ তো চল না, আমিও না হয় আজ খানিকটা ঘুরলামই। আগে যেমন অকারণ পথে ঘুরতাম !" ভুলে যাওয়া অতীত স্মৃতি !

"না, কিন্তু মানে আমি একটা বান্ধবীর বাড়িতে যাবো।"

"বান্ধবী ! ওঃ তাহলে তো নাচার। কিন্তু মনে হচ্ছে কৌশল করে এই জিনিস কটার ভার হয়তো বা পুরোপুরিই গছাচ্ছিস। যা নিষ্ঠুরপ্রাণা তুই, সবই পারিস ! এই জন্যেই কেউ তোকে দুচক্ষে দেখতে পারে না, বুঝলি ?"

"খুব সম্ভব ! কিন্তু—" সুচেতা মুখ তুলে তাকায়, চোখের কোলে তখনো অশ্রুরেখা, সেইটার কথা বোধ করি ভুলেই গিয়ে একটু হেসে বলে, "এগুলোর সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকো, এখনো বোধ হয় এতোটা নিষ্ঠুরপ্রাণা হয়ে উঠতে পারি নি।"

"অনেক ধন্যবাদ ! কবে যাচ্ছিস যেন ?"

"কাল।"

"হুঁ। একা যেতে হবে, না এস্কর্ট করবার জন্যে কেউ থাকবে ?"

"থাকবে। স্কুলের সেক্রেটারী।"

স্কুলের সেক্রেটারী শুনে বোধ করি ছোড়দার কিঞ্চিৎ সমীহ বোধ আসে, তাই উদাসভাবে বলে, "যা ! চলেই যা ! টিঁকিতে পারবি না অবিশ্যি, তবু জীবনে কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ও ভালো।"

সুচেতা তখন ভাবছে, ভাগ্যিস ছোড়দা সেক্রেটারীর নাম জিজ্ঞেস করে নি। 'দামোদর গুঁই' শুনলে ছোড়দা কী ভয়ঙ্কর রকমের অশ্রদ্ধা করতো ! সুচেতার প্রতিও অশ্রদ্ধা এসে যেতো হয়তো।

জিনিসগুলো হাতে কাঁথে সাপটে লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে যায় ছোড়দা। সুচেতা তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। ছোড়দাও দুঃখী, ছোড়দাও

নিঃসঙ্গ ! অল্পবয়সে যারা মাতৃহীন হয়, তারা বোধ করি চিরদিনই দুঃখী আর নিঃসঙ্গ থেকে যায়। অল্পবয়সে মাতৃহীন পিঠোপিঠি ভাই বোন তারা। সুচেতার 'মা' বলতে কিছুই মনে নেই, ছোড়দা বলে—ওর না কি আব্‌ছা স্বপ্নের মত মনে আছে, কে একজন সব সময় বিছানায় শুয়ে থাকতো, আর হঠাৎ একদিন সকালবেলা উঠে দেখলো বিছানাটা খালি, তোশক-বালিশগুলো পর্যন্ত কোথায় মিলিয়ে গেছে। আর একটা কালোমত মেয়েমানুষ খুব জল ছিটিয়ে ছিটিয়ে ঝাঁটা আছড়ে ঘরটাকে ধুচ্ছে।

দৃশ্যটা ভয়ানক খারাপ লেগেছিল ছোড়দার, ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল সেখান থেকে। তারপর জীবনে আর কোনদিন দেখে নি সেই শয্যা-শায়িনীকে। প্রশ্নও করে নি কাউকে। কী এক দুরন্ত অভিমানে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। ছোড়দা বলেছে, "অথচ আজ পর্যন্ত নিজেই বুঝতে পারি না অভিমানটা কার ওপর ?"

সুচেতাও বুঝতে পারে না কার উপর তার এই অভিমান। তবু অভিমানে খান খান হয়ে যাচ্ছে প্রাণটা।

ছোড়দা কেন ওর ব্যঙ্গের ভঙ্গিটাই বজায় রাখলো না ? কেন ভালো ব্যবহার করলো, কেন তুললো ভুলে যাওয়া ছেলেবেলার কথা ? বড়দা কেন জামার হাতা তুলে চোখ মুছলেন ? সুচেতা যখন ত্যাগপত্রে স্বাক্ষর করে বিদায় চাইলো, তখনই ওদের সাধ গেল বহুদিনের আবরণ পড়ে যাওয়া জমাট বালুর স্তর সরিয়ে ভিতরের ফল্গু ধারাকে খুঁড়ে বার করতে ?

বান্ধবীর বাড়ির কথাটা বাজে কথা।

লজ্জা করছিল জিনিসপত্র কিনে ছোড়দার সঙ্গে আদুরে বোনটির মতো বাড়ি ফিরতে। একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে ভাবলো। কি করে অন্ততঃ খানিকটা সময় ব্যয় করে তবে বাড়ি ফেরা যায়। ও আচ্ছা, দু-একটা ফটোর ফিল্‌ম কেনার কথা ছিল। কথা ঠিক নয়, ইচ্ছে। কুমারী

বেলায় কমবয়সে একবার ফটো তোলবার ভারি শখ চেগেছিল সুচেতার, এবং খুব সম্ভব বড়দার অব্যবহৃত পুরনো একটা 'বক্স ক্যামেরা' নিয়ে বেশ কিছুদিন বাড়ি সরগরম করে তুলেছিল।

তারপর কবে কখন মিলিয়ে গিয়েছিল সে শখ, যেমন অনেকেরই যায়। সেদিনকে হঠাৎ একটা আলমারীর মাথা থেকে জিনিসটা আবিষ্কার করেছে ধূলিধূসরিত অবস্থায়। কী খেয়াল হলো, ঝেড়ে মুছে জিনিসটা সঙ্গে নিচ্ছে। জানে না কী পরিবেশে গিয়ে পড়বে, তবু ভাবলো ছুটির দিনে অবসর বিনোদন হিসেবে হয়তো কাজে লাগতে পারে। মাঠ জঙ্গল, ডোবা পুকুর, ভাঙামন্দির, পড়োবাড়ি, আছে তো নিশ্চয়ই!

বটুয়ার মধ্যে টাকা তো কিছু রয়েইছে, কিনেই নিয়ে যাওয়া যাক।

বাস নয়, ট্রাম নয়, ট্যাক্সি নয়। কী খেয়ালে একটা রিকশায় উঠে বসলো। এই একটা যান, যার মধ্যে কেবলমাত্র নিজেকে নিয়ে শান্ত গতিতে এগিয়ে যাওয়া যায়। এতে হাওয়া-গাড়ির উদ্দাম বেগ নেই, নেই বাস ট্রামের জনারণ্য। সেকালে এই জন্যই বোধকরি আয়েসী ব্যক্তিদের মধ্যে পাল্‌কীর চলনটা বেশী ছিল। একবার উঠে বসতে পারলেই হলো, পথের নির্দেশটা দিয়ে দিলেই হলো। জন্তু নয়, যন্ত্র নয়, টেনে নিয়ে যাবে জলজ্যান্ত মানুষে। যে নিজের প্রাণের মায়াতেও অন্ততঃ রাস্তার বিপদ বাঁচিয়ে চলবার দায়িত্ব নেবে।

কিন্তু ফিল্‌ম কি চট করে পাওয়া যাবে? আজকাল তো দুষ্প্রাপ্য। হঠাৎ একটা স্টুডিওর কথা মনে পড়লো।

বড় রাস্তার উপর একতলা ছোট্ট একটু ঘর, তার মধ্যেই নানা ব্যবসা। ফটো তোলে, বাইরের ফটো ডেভেলাপ করে, প্রিণ্ট করে, আবার ফটো সংক্রান্ত বহুবিধ সরঞ্জাম বিক্রীও করে। ছোট্ট, কিন্তু ভিতরের স্টক প্রচুর।

সৌরেশের সঙ্গে এসেছিল কয়েকবার দুজনে ফটো তোলাতে। জন্মদিনে, নববর্ষে, বিবাহ-বার্ষিকীতে একটা করে যুগল ফটো তোলা বাতিক ছিল সৌরেশের।

অনেক দোকান ছেড়ে, অনেক রাস্তা পার হয়ে, সেই স্টুডিওটার সামনে এসে রিকশাটাকে থামালো সুচেতা, আর থামিয়েই থমকে দাঁড়ালো।...ভিতরে কাউণ্টারের সামনে ও কে কথা বলছে স্টুডিওর মালিকের সঙ্গে ?

মুখ নয়, শুধু পিঠটাই দেখা যাচ্ছে, তবু যেন আঠা দিয়ে আটকে যাবার মত আটকে গেল সুচেতা। অথচ যাবার কথা আদৌ নয়।

এখানে, বাড়ি থেকে এতদূরে, সৌরেশ এসে স্টুডিওর কাউণ্টারের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে খালি পায়ে আর খালি গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে, এতোটা কষ্টকল্পনা নিতান্ত উদভ্রান্ত অবস্থা না হলে হবার কথা নয়।

তা সেই উদভ্রান্তের মতই দাঁড়িয়ে থাকে সুচেতা, লোকটা মুখ ফেরাবার আশায়।

কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে না, যাবার কথাও নয়, তবু বুঝি সমস্ত ইন্দ্রিয় তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে সামান্যতম স্বরের আভাসের আশায় !

কথা শেষ হলো।

কাউণ্টারের দিক থেকে ঘুরে দরজার দিকে মুখ ফেরালেন ভদ্রলোক, আর সঙ্গেসঙ্গেই চোখোচোখি হলো পথপ্রান্তবর্তিনীর সঙ্গে—যে মেয়ে স্থান কাল পাত্র, বোধ করি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিস্মৃত হয়ে সমস্ত চৈতন্যকে দৃষ্টির সীমানায় কেন্দ্রীভূত করে দাঁড়িয়ে আছে, শুধু এই মুখ ফেরানোর অপেক্ষায়।

জানে সুচেতা, মুখ ফেরানোর মুহূর্তেই ভেঙে যাবে উৎকণ্ঠ প্রতীক্ষার দুঃসহ আনন্দ, তবু নিশ্চিত জেনে যাওয়া চাই। অথচ দেহে এমন শক্তি খুঁজে পাচ্ছিল না যে সরাসর দোকানে উঠে পড়ে নিজের প্রার্থিত বস্তুটি চাইবার অবকাশে দেখে নেবে, ওই অদ্ভুত ধরণের একছাঁদের লোকটাকে। কিন্তু একী ! স্বপ্ন, না মায়া ! নাকি কোন যাদু ! লোকটা সত্যিই রূপান্তরিত হয়েছে সৌরেশেই।

তবু ? সৌরেশ খালি পায়ে ?

সৌরেশ চাদর গায়ে ?

হ্যাঁ, সৌরেশই খালি পায়ে, সৌরেশই খালি গায়ে চাদর জড়িয়ে !

কালিমাড়া মুখ, ক্লান্ত অবসন্ন দৃষ্টি, সেই কালো রেশমের মত বড় বড় সুন্দর চুলগুলি ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া এলোমেলো !

বাঙালী ঘরের মেয়েকে বলে দিতে হয় না এ চেহারা কিসের ! কিন্তু সৌরেশের কেন এ চেহারা ? বুঝলেও বুঝতে দেরী হয়। সুচেতা এমন বিহ্বলভাবে তাকিয়ে থাকে, দেখে মনে হতে পারে, বুঝি সৌরেশ কিনা ঠিক চিনতে পারছে না।

সৌরেশ হয়তো এ দৃষ্টি লক্ষ্য করে না, ও শুধু লক্ষ্য করেছে সুচেতা একটা রিক্‌শ থেকে নেমেছে স্টুডিওর সামনে।

"এখানে, এমন ভাবে ?" সৌরেশই প্রশ্ন করে দাঁড়িয়ে পড়ে।

সুচেতা সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে রুদ্ধস্বরে বলে, "তুমি ? তোমার কি হয়েছে ?"

"আমার ?" সৌরেশ ম্লান হেসে বলে, "আমার কিছু হয় নি, বিপিনদা মারা গেলেন। এই সবে শ্মশান থেকে ফিরছি।"

বিপিনদা মারা গেলেন !

বুকটা ধ্বক্ করে ওঠে সুচেতার। বিপিনদাকে যে ভিতরে ভিতরে কত ভালবাসে সৌরেশ সে কথা তো তার অজানা নয়। এখনও তাই অজানা থাকলো না সৌরেশের এই সহজ ভঙ্গীর অন্তরালে প্রচ্ছন্ন রয়েছে কী গভীর বেদনা ! তবু কোন সান্ত্বনার বাণীই জোগাল না মুখে, শুধু সৌরেশের কথাটাই আস্তে উচ্চারণ করলো "বিপিনদা মারা গেলেন ?"

"হ্যাঁ ! কাল রাত্রে। ভোরবেলাই ডাকতে এল বড় ছেলে লালু।"

সুচেতা আড়ষ্ট ভাবে বলে, "কিন্তু এখানে কি ?"

"এখানে ? ও হো হো !" সৌরেশ বলে. "সত্যি এখানে এ অবস্থায় আসাটা উচিত হয় নি বটে। কি খেয়াল হলো একেবারে

ভিজে মাথায় খালি পায়েই—মানে আর কি শ্মশান যাত্রার প্রাক্কালে বিপিন-বৌদি আছড়ে পড়ে গড়াগড়ি দিয়ে জানিয়েছিলেন বিপিনদার না কি একখানাও ফটো নেই, অতএব শবদেহের একখানা ফটো যেন তোলা হয়। নইলে কী নিয়ে বাকী জীবনটা কাটাবেন তিনি?' তাঁর প্রথম আদেশ পালন করা হয়েছে। দ্বিতীয় আর একটি আদেশ —সেই ফটোখানি যেন এনলার্জ করে এবং ভাল করে বাঁধিয়ে আনা হয়, যাতে শ্রাদ্ধবাসরে সাজানো চলে। তাই এদের কাছে জানতে এসেছিলাম কদিনের মধ্যে এনলার্জ করে দিতে পারবে।"

সুচেতা আরও আস্তে বলে, "মৃতদেহের ছবির এনলার্জমেণ্ট! এত বড় জীবনে একখানাও ফটো ছিল না?"

"তাই তো দেখছি," সৌরেশ একটু ক্ষুব্ধহাসি হেসে বলে, "এই তো জীবন আমাদের, এই তো মূল্য! প্রথমটায় আমিও অবিশ্যি একটু বিস্মিত হয়েছিলাম যে, এত বড় জীবনটায় একবারও ক্যামেরার সামনে দাঁড়ান নি বিপিনদা! ভাবলে সত্যিই আশ্চর্য লাগে না? তারপর ভেবে দেখলাম আশ্চর্যই বা কেন, আমাদের দেশের নীতিই তো—না মরলে স্বীকৃতি নেই।"

সুচেতা ও কথার আর উত্তর না দিয়ে শান্তগলায় বলে "কী হয়েছিল ওঁর?"

"কিছু না, কিছু না! ছেলেরা বললো 'হার্টফেল'। হার্টটা অবিশ্যি ফেলই করে বসলো আচমকা, তবে মূল কারণ সেই আদি ও অকৃত্রিম! পচা লিভারের বিষক্রিয়া! থাকগে ওকথা, তুমি এখানে কেন?"

"একটা দরকারে এসেছিলাম।" বলে এবার চঞ্চলভাবে পারিপার্শ্বিকতার উপর দৃষ্টিপাত করে সুচেতা। আশেপাশে পরিচিত কেউ নেই তো? তারা দেখে চিনে ফেলে নি তো সুচেতা রাস্তায় দাঁড়িয়ে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে কথা বলছে তার ভূতপূর্ব স্বামীর সঙ্গে? ছি ছি, কী লজ্জা!

লজ্জা অস্বস্তি বোধ করি সৌরেশেরও হচ্ছিল। অন্ততঃ নিজের বেশভূষার জন্যেও। তাই কেমন একরকম হেসে বল্লে, "ভোরবেলা থেকে বৃষ্টিতে ভেজা হয়েছে, এখন আবার মেঘভাঙা রোদের তাত, শরীরটা অসুবিধে ঠেকছে, চলে যাই কেমন ?"

সুচেতা নীরবে চোখ তুলে তাকায়।

সৌরেশই আবার বলে, "আশ্চর্য হওয়ার কথা বলছিলাম, কিন্তু ভেবে দেখলে এটাই কি কম আশ্চর্য সুচেতা যে, একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে দুজনে দুজনের কাছে বিদায় নিয়ে দুদিকে চলে যাবো!"

"জগতের কোন ঘটনাতেই আশ্চর্য হবার নেই—" হঠাৎ নিজের স্বভাবে ফিরে আসে সুচেতা, তীক্ষ্ণ স্বরে বলে, "নইলে তো—আরোই আশ্চর্য হবার কথা যে তুমি এই নিয়ে দিব্যি সহজে আক্ষেপ প্রকাশও করছো! সে যাক, বিদায় নেওয়ার কথাই যখন তুললে তো বলি, তোমাদের কলকাতা থেকে বিদায় নিচ্ছি আমি।"

"আমাদের কলকাতা থেকে! কলকাতা থেকে বিদায় নিচ্ছ ?"

"হ্যাঁ।"

মুহূর্তে অনুমান করে সৌরেশ, নিশ্চয় কোন চাকরীর ব্যাপার! কিন্তু সুচেতা কোন্ চাকরীর যোগ্য ? তাই উদ্বিগ্ন ভাবে বলে, "কোথায় যাচ্ছ ?"

"অখ্যাত অজ্ঞাত কোন একটা জায়গায়। আমার তো আর সেক্রেটারিয়েটে চাকরী হবে না!"

"চাকরী করতে যাচ্ছ তুমি ?" গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রুদ্ধস্বরে প্রশ্ন করে সৌরেশ।

"তা একটা তো কিছু করতে হবে।" অকারণ হেসে ওঠে সুচেতা।

"কিন্তু কী চাকরী ?"

"বললাম তো, সেটা কোনমতেই উল্লেখযোগ্য হবে না। ধরে নাও, পাড়াগাঁয়ের মেয়েস্কুলে নীচু ক্লাশের টিচারী! ধরে নিতে পারো, খাওয়া থাকা বাদে, তিরিশ টাকা মাইনে।"

হ্যাঁ, শোধ দিতে পেরেছে সুচেতা! সৌরেশকে শোধ দিতে পেরেছে! ওর সেই কালিমাড়া মুখে, আর ক্লান্ত দুই চোখে সহসা যেন আগুন জ্বলে উঠেছে।

"তিরিশ টাকা!"

"তা এ বিদ্যেয় আর কত বেশী হবে? এবং দাদাদের গলগ্রহ হয়েই বা আর কতদিন চালাবো? আচ্ছা চলি।"

আঘাত দিতে পারার অসহ্য সুখে দিশেহারা সুচেতা ভুলে যায় এখানে তার 'দরকার ছিল।' ভুলে যায় সেই দরকারের কথাটা নিজে বলেছে সৌরেশের কাছে।

স্তব্ধ বিষণ্ণ পাথরের পুতুলের মত নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকা সৌরেশের মুখের সামনে দিয়ে "আচ্ছা চলি" বলতে পেরেছে এই যথেষ্ঠ। তাছাড়া 'উপরি লাভ'— তাকে শুনিয়ে দেওয়া, এখন নিজের ভরণপোষণের জন্য মাথা ঘামাতে হচ্ছে সুচেতাকে। হচ্ছে তিরিশ টাকা মাইনের চাকরী করতে যেতে অখ্যাত অবজ্ঞাত কোন পল্লীগ্রামে।

সুচেতার শাড়ির আঁচল জনারণ্যে মিলিয়ে যাবার পরও রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইল সৌরেশ, তারপরই সহসা একটা নিশ্বাস ফেলে একখানা চলন্ত ট্যাক্সীতে চড়ে বসলো। আর ভয়ঙ্কর আশ্চর্যের কথা, তার কোলে নিজেকে নিক্ষেপ করে সৌরেশ পথের একটু নির্দেশ দিয়ে সমস্ত কিছু ভুলে প্রায় ঘুমিয়ে পড়লো।

চিন্তা করবার শক্তি খুঁজে পাচ্ছে না সৌরেশ। হারিয়ে ফেলেছে অনুভূতির তীব্রতা। মাথার মধ্যে রিমঝিম করে একটানা শব্দ হয়ে চলেছে মাঝ রাত্তিরে টিপি টিপি বৃষ্টি পড়ার শব্দের মত!

অবিচ্ছিন্ন, অবিশ্রান্ত!

আর সুচেতা? না সুচেতার কথা জানি না।

তার মনের অবস্থা বোঝবার মত ক্ষমতা এখন স্বয়ং তার সৃষ্টি-কর্তারও নেই।

শুধু জানি, সুচেতা বাড়ি ফিরেছিল দুপুরটা পার করে প্রায় বিকেল ছুঁই ছুঁই বেলায়। আর ফিরে বলেছিল বান্ধবীর বাড়ি খেয়ে এসেছে, আর খাবে না।

আজ আর কেউ কোন মন্তব্য করে নি। করবে না বলেই করে নি।

যে অপরাধী মাত্র ছাব্বিশ ঘণ্টা পরে চলেই যাবে, তাকে আর তার অপরাধ সম্বন্ধে সচেতন করিয়ে দেবার প্রয়োজনই বা কি?

সে যখন নিশ্চিত 'চুলোয়' যেতে বসেছে, তখন আর তাকে ফেরাবার জন্য বৃথা শক্তিক্ষয়ের রুচি কার থাকে? তবু রক্ষে যে বাড়ি বসে 'চুলোর' দরজার পথ সুগম করবার চেষ্টা বেশীদিন করে নি! বাড়ি থেকে সরে যাচ্ছে।

"কী খবর? সৌরেশ বাবু না কি? ব্যাপার কি?"

অফিসের 'চেয়ার'টা মূল্যবান নয়। তবু অফিসারের কায়দায় পিঠ টান টান করে চেয়ারে বসে ঊর্ধ্বমুখে 'পাইপ' টানছিল ছোড়দা, হঠাৎ সৌরেশের আবির্ভাবে একটু অবহিত হয়ে সোজা হয়ে বসলো।

সৌরেশ ভূমিকা করলো না, সোজাসুজি প্রশ্ন করলো, "সুচেতা কোথায় যাবে?"

ছোড়দা যদিও বয়সে সৌরেশের চাইতে ছোট, কিন্তু সুচেতার 'দাদাত্বের' অধিকার বলে সৌরেশের সঙ্গে বিনা সমীহতেই কথা বলে। 'আপনি' সম্বোধনের মাধ্যমেও যে কতটা অগ্রাহ্য করা যায় ছোড়দা যেন তার নমুনা একটি। তবে সত্যি বলতে সমীহ সে কাকেই বা করে? যাদের করা উচিত, পারতপক্ষে তাদের ছায়া

মাড়ায় না। তাই সৌরেশের প্রশ্নে ঠোঁটের কোণে একটু হাসি এনে বলে, "কৌতূহলটা একটু অসমীচিন হয়ে যাচ্ছে না কি ?"

"সমীচিন অসমীচিনের তর্ক থাক, উত্তরটা দাও।"

ছোড়দা সহসা গম্ভীর ভাবে বলে, "উত্তর দিতে আমি বাধ্য নই।"

সৌরেশ বোধ করি প্রস্তুত হয়েই এসেছিল, কিম্বা ভেবেছিল মেজদার সেজদার চাইতে তবু ছোড়দা ভাল। ওর কাছ থেকে মান আর অপমানের আলাদা কোন মূল্য নেই। কাজেই স্থির শান্ত ভাবেই বলে, "বাধ্য না হয় না হলে, বলতে আপত্তিই বা কি ?"

"আছে আপত্তি।" ছোড়দা ভুরু কুঁচকে বলে, "থাকবে না কেন ? সুচেতার খবর জানবার আপনার অধিকার কি ? ওর সঙ্গে আপনার আর কিসের সম্পর্ক ?"

সৌরেশ মৃদুম্লান একটু হেসে বলে, "কিসের সম্পর্ক, সে তোমাকে বোঝানো যাবে না ছোড়দা, কিন্তু আমি বলি কি একটু সৌজন্য প্রকাশ করতে তোমার ক্ষতি কি ?"

'ছোড়দা' সম্বোধনটা বোধকরি মনের কোন তন্ত্রীতে ঘা দেয়। ছোড়দা ঈষৎ নরম সুরে তুই হাত উল্টে হতাশার ভঙ্গী করে বলে, "আরে বাবা জানলে তো দেবো ? নিজেই জানি না তার জানাবো কি অন্যে।"

"নিজেই জানো না ?"

"নাঃ! সংসারে কে কার ধার ধারছে ? বহুকাল পরে কাল একবার ভগ্নীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তখন শুনলাম কী একটা অভাগা চাকরী নিয়ে কোন একটা অখদ্যে জায়গায় নাকি চলে যাচ্ছে। বেশী কিছু প্রশ্ন করতে বাধলো। বুঝলামই তো চাকরীটা কিছু নয়, চলে যাওয়াটাই প্রধান।"

"হুঁ! বুঝতে পারছি। শুধু বুঝতে পারছি না, সহসা সেটা এমন 'প্রধান' হয়ে উঠলো কেন ?"

"ধোঁয়াটা অনেকক্ষণের, আগুনটা সহসাই দেখা যায়।"

"কেউ বারণ করো নি? কেউ আটকাবার চেষ্টা করো নি?" অনেক চেষ্টা করেও কণ্ঠস্বরের ব্যাকুলতা চাপা দিতে পারে না সৌরেশ।

ছোড়দা আস্তে আস্তে বলে, "কেউ কিছুই করি নি। তবে বারণ করলেই কি কিছু লাভ হতো?" একটু হাসে ছোড়দা, "জানেন তো ওকে?"

"তা তো জানি, কিন্তু এও যে জানি," অদ্ভুত একটা উৎকণ্ঠা ফুটে ওঠে সৌরেশের কণ্ঠে, "কষ্ট সহ্য করতে মোটেই পারে না ও। শুনলাম নাকি তিরিশ টাকার চাকরী! একথা সত্যি?"

"আমাকে তো তাই বলেছে। আপনাকে কে বললো?"

"সুচেতা নিজেই।"

"সুচেতা নিজেই! গিয়েছিল সে?" ছোড়দার কণ্ঠে উত্তেজনা।

"নাঃ! সে সৌভাগ্য হয় নি, পথে দেখা হয়েছিল কাল। কাল দু-তিন বার তোমার এখানে ফোন করবার চেষ্টা করেছি, সাড়া পাই নি—"

"কাল! কাল আমি অফিসে আসি নি।"

"হ্যাঁ, পরে বললো একজন। যাক সুচেতার খবরটা তাহলে সত্যি!" একটা নিশ্বাস ফেলে বলে, "কখন যাবে সে কথা জানো?"

"কখন? না সে কথা জানি না।" ছোড়দা হঠাৎ পাইপটা নিয়ে বেশী মাত্রায় ঠোকাঠুকি করতে করতে বলে, "তবে এটুকু জানি যাবে আজই। মনস্থ করেছি রাত বারোটার পর বাড়ি ফিরবো। আশা করছি ততক্ষণে ব্যাপারটা মিটে যাবে।"

"ছেলেমানুষী কোর না ছোড়দা," সৌরেশ ওর টেবিলের ওপর রাখা হাতটা চেপে ধরে বলে, "ফেরাতেই হবে ওকে।"

"ফেরাতে? কোথায়?" ছোড়দা উদাসভাবে বলে।

সৌরেশ দৃঢ়ভাবে বলে, "আত্মহত্যার পথ থেকে যে কোন কোথাও। ওর ওই চাকরী নেওয়া আত্মহত্যা ছাড়া আর কি?"

"তা অন্ততঃ আপনার আত্মকে বা আত্মাটাকে হত্যা করবার স্বাধীনতা প্রত্যেকেরই আছে।" ফের পাইপটা মুখে তুলে নেয় ছোড়দা।

"দোহাই তোমার, ওই পচা দার্শনিকতা রাখো। বাড়িতে ফোন করে এটুকু অন্ততঃ জেনে নাও কখন যাবে ও, আর যাবে শেয়ালদায় না হাওড়ায় ?"

ছোড়দা উঠে দাঁড়িয়ে কায়দা করে মাথাটা ঝুঁকিয়ে বলে, "জেনে কি করবেন ব্রাদার ? চুল ধরে বিপথ থেকে টেনে আনবার অধিকার তো হারিয়ে বসে আছেন !"

সৌরেশের মুখে ক্ষীণ একটু হাসি ফুটে ওঠে।

সেই হাসির আভাস থেকে উচ্চারিত হয়, "অধিকার জিনিসটা বড় গোলমেলে ছোড়দা, ওটা কোথায় থাকে আর কি করে হারায় ধরা শক্ত। কিন্তু তুমি একটু তাড়াতাড়ি করো। আমি যে ঠিক সাহস পাচ্ছি না। কাকে ডাকবো, কে ধরবে ? হয়তো আমাদের মাননীয়া সেজবৌদিই ধরলেন --"

ছোড়দা মুখটা একটু বিকৃত করে উঠে চলে গেল ঘরের কোণের দিকে টেলিফোনের কাছে।

সত্যি, বিধাতা কি অবিচারক ! তার নিজের টেবিলে একটা টেলিফোন নেই !

সৌরেশ উৎকর্ণ হয়ে শুনতে থাকে ছোড়দার অলস অলস কণ্ঠস্বর, —"চারটের গাড়ি ? ··জিনিসপত্র সব রেডি অথচ কোথায় বেরিয়ে গেছে ! কোথায় কেউ জানে না ? জায়গাটা কি হলো ? শক্তিগড় ? সেটা আবার কোন লাইনে ? হাওড়া না শেয়ালদা ? হাওড়া ? আচ্ছা ঠিক আছে।"

নিজের চেয়ারে এসে বসে পড়ে ছোড়দা বলে, 'আশাকরি আর রিপিট করতে হবে না ? মর্মোদ্ধার করতে পেরেছেন ? এখন দেখুন গে। আমার তো মনে হচ্ছে হঠাৎ কারো কোনো বিষাক্ত মন্তব্যের ধাক্কায় জিনিসপত্র ত্যাগ করেই চলে গেছে।"

সৌরেশ শ্রান্ত চোখ তুলে ম্লান ভাবে বলে, "ওকথা বলছো কেন, সুচেতাকে তো বাড়িতে সকলেই ভালবাসে।"

"তা বটে!" ছোড়দা ফের পাইপটা ধরাতে ধরাতে বাঁকা ঠোঁটে বলে, "অন্ততঃ সকলের ও হিতাকাঙ্খী তো বটেই!"

বিপিনদার মৃত্যুসংবাদ সুচেতাকে এমন বিচলিত করে তুলেছে কেন?

বিপিনদাকে কি সুচেতা কোনদিন এককণাও ভালবেসেছে? সামান্যতম ভক্তি শ্রদ্ধাও করেছে? আত্মীয় সম্পর্কের স্বীকৃতি মাত্র দিয়েছে? মানুষ বলেই কি মনে করেছে কোনদিন?

'বিপিনদা' নামক জীবটা সৌরেশের জীবনের শনি, সুচেতার ভাগ্যের রাহু. এই মাত্র! কিন্তু এ কী হলো! কাল থেকে কেন অনবরত কানের পর্দায় ধ্বনিত হয়ে চলেছে একটা ধূসর শূন্য কণ্ঠ—"বিপিনদা মারা গেলেন।"

সে কণ্ঠের বিশ্লেষণ হয় না।

শোক নয়, দুঃখ নয়, আবেগ নয়, আক্ষেপ নয়, শুধু খানিকটা শূন্যতা।

সৌরেশের হৃদয়ে বিপিনদার স্থান কোথায় ছিল, এর আগে এমন করে বুঝি কোনদিন কোন সময় জানতে পারে নি সুচেতা, কাল প্রথম পেরেছে।

কিন্তু পেরে কি করেছে সুচেতা?

কী অদ্ভুত মানবিকতা দেখিয়েছে? কী সুন্দর হৃদয়বত্তার পরিচয় দিয়েছে!

বারে বারে মনে হচ্ছে, সুচেতা যেন কার একটা বেদনাক্ত জায়গা দুই পা দিয়ে মাড়িয়ে এসেছে!

আবার শুধু মাড়িয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হয় নি, বিধাতার 'মার' আর মানুষের 'মার' খাওয়া সেই ক্লান্ত কালিপড়া মুখটার ওপর সজোরে বসিয়ে দিয়ে এসেছে একটা চাবুকের ঘা!

সৌরেশের সেই শ্রান্ত ক্লান্ত বিষণ্ণবিধুর চেহারাটা দেখেও মমতা আসে নি সুচেতার, সুযোগ পেয়ে শোধ নিয়েছে!

নইলে সৌরেশের সামনে তখন সুচেতার এই তিরিশ টাকার চাকরীর কথাটা কি না বললেই চলতো না? সৌরেশকে দেখলেই কেন ওকে আঘাত দেবার ইচ্ছে করে সুচেতার? করে যদি, তো পরে এমন জ্বালা হয় কেন? কই 'শোধ' দিতে পেরে তো জয় গৌরবের আনন্দ নেই? মন শুধু ধ্বসেই যাচ্ছে। অথচ কতোগুলো বিনিদ্র রাত্রি কাটিয়েছে সুচেতা, সৌরেশকে কেমন করে তার কৃতকর্মের শোধ দেবে ভেবে ভেবে! শোধ দেওয়া তো হলো! তবে?

গোছানো জিনিসপত্রের মাঝখানে কয়েকখানা বই ছড়িয়ে চুপ করে শুয়েছিল সুচেতা। আর ঘণ্টা খানেক পরেই যাত্রা করতে হবে, অথচ উৎসাহের কণা মাত্র নেই। কোথায় গেল প্রাণের মধ্যে বেজে ওঠা সেই মুক্তির সুর?

কেন মনে হচ্ছে কে যেন সুচেতাকে হাত পা বেঁধে জলে ফেলে দিতে চাইছে?

আচ্ছা সৌরেশ সুচেতাকে কত ছোট ভাবলো! কত ছোট কত নীচ!

একটা মানুষের মৃত্যু সংবাদে যে, সামান্যতমও 'আহা' করতে হয়, সেটুকুও করে নি সুচেতা! অথচ সেই মানুষটা কী অভাগা, কী বেচারী! সারা জীবনে যে লোকটা একবার ক্যামেরার সামনে দাঁড়ায় নি, আর যার স্ত্রী তার একটা ছবির প্রয়োজন অনুভব করেছে, তার শ্রাদ্ধ বাসরে সাজাবার জন্যে! নেশার পয়সার জন্যে দূর সম্পর্কের ছোট ভাইয়ের কাছে হাত পাততে যার বাধতো না, অথচ আভিজাত্যের অহঙ্কার ছিল ষোল আনা, সেই দড়ি পাকানো চেহারার দুঃখী লোকটাকে কি তবে ঈর্ষা করতো সুচেতা? সৌরেশের ভালবাসার ভাগীদার বলে?

সুচেতার মুদ্রিত দুই চোখের কোণ বেয়ে দুফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো। মনে মনে বললো, 'ওগো শোনো, বিশ্বাস করো, আমি কোনদিন তোমার বিপিনদার মৃত্যু কামনা করি নি।'

একটু জল খেলে ভাল হয়।

ঘরে কুঁজো আছে, জলও আছে, বিছানা থেকে একটু উঠে ঢেলে খাবার ক্ষমতা হচ্ছে না। ঘরে হঠাৎ কেউ এসে পড়বে এ আশাও নেই। কদিন থেকে এ ঘরটাকে যেন সবাই ভুলে গেছে। সুমিতা পর্যন্ত তার দখলীস্বত্ব ছেড়ে অন্য ঘরে গিয়ে লেখাপড়া করছে।

মেজবৌদিও নিস্তব্ধ।

হিসেব মত বলা চলে সুচেতার সঙ্গে তাঁর বাক্যালাপ বন্ধ। আহত হয়েছেন তিনি, নিতান্ত আহত হয়েছেন।

সুচেতা যে এমনভাবে তাঁর ভালবাসার অমর্যাদা করবে এ বোধ করি তিনি আশা করেন নি। কিন্তু সুচেতার কাছে আবার কার কি আশা করবার আছে? সুচেতা কবে কার ভালবাসার মর্যাদা রেখেছে?

তবু সুচেতাকে আজও কেউ কেউ ভালবাসে।

ছোড়দার দেওয়া গতকালের সেই ছোটখাটো প্রয়োজনীয় আর প্রসাধনের টুকিটাকি জিনিসগুলো গুছিয়ে বাক্সে তুলে রাখতে সহসা একটা সত্য আবিষ্কার করেছে সুচেতা। সৌরেশের কথাই ঠিক। সেদিন অপমানের জ্বালায় ছটফটিয়ে উঠেছিল সুচেতা, আজ আর স্বীকার করতে দ্বিধামাত্র নেই—ঠিকই বলেছিল সৌরেশ, "মদের সঙ্গে ঠিকই আপোস চলে সুচেতা, চলে না শুধু স্বার্থহানির সঙ্গে।" কথাটা সত্যি না নইলে ছোড়দাকে কিছুতেই কেন ঘৃণা করতে পারলো না সুচেতা?

ছোড়দা মদ্যপ, হয়তো বা ছোড়দা চরিত্রহীনও। তবু ছোড়দা, ছোড়দাই।

তবে কেন? কেন সৌরেশ সৌরেশই হয়ে রইল না? কেন সুচেতা সৌরেশকে পারলো না তেমন সহজ ভাবে নিতে?

কিন্তু পারলো না যে, তার কারণ কি শুধু ঘৃণা?

অভিমান নয়?

কিন্তু সৌরেশ সে কথা টের পেল না। সৌরেশ সুচেতাকে চিরকালের মত ভুল বুঝেই থাকলো। কালকের ব্যবহারে সে ভুলের বনেদ আরো শক্ত করে দিয়েছে সুচেতা!

বুকটা কেমন ধড়ফড়িয়ে উঠলো।

তেষ্টার জন্যেই কি?

জল খেয়ে গ্লাসটা রাখতে গিয়ে সহসা চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়লো সুচেতা। ঘরের বাইরে তার ভাইঝিরা গল্প করছে, তেরো বছরের অনিতা আর দশবছরের সুমিতা। সুমিতার গলাটাই তীক্ষ্ণ বেশী, ওর মায়ের গলা পেয়েছে সে!

"পিসির আহ্লাদটা একবার দেখলি? দিব্যি ক্যামেরাটি বাগিয়ে নিয়ে পালাচ্ছেন। কবে কোন জন্মে ছেলেবেলায় ওটা নিয়ে একটু খেলা করেছিলেন বলে অমনি জিনিসটা ওঁর হয়ে গেল! বাড়ির জিনিসটা নিয়ে যাবেন উনি! একেই বলে জোর যার মুলুক তার।"

গ্লাসটা রেখে দিয়ে ধীরে ধীরে ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়ালো সুচেতা। মুহূর্ত কয়েক কী ভাবলো, তারপর সুটকেসের চাবিটা খুলে দু-একটা জামা কাপড়ের নীচে থেকে সেই ছোট্ট বক্স-ক্যামেরাটুকু বার করে নিঃশব্দে সুমিতার পড়ার টেবিলের ওপর রাখলো। হয়তো বা একবার ভাবলো 'মানুষ মানুষকে বুঝতে পারে না কেন?'

তারপর ঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে দেখে, সকলের অলক্ষ্যে আস্তে আস্তে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

কিন্তু মানুষ কি নিজেকেই নিজে ভাল করে বোঝে?

সুচেতা কি বুঝেছিল তার ভিতরে ভিতরে কতখানি ভাঙন ধরেছে?

আজ যখন পথে বেরোলো তখন কি একবারও বুঝেছিল এমন একটা লোকহাসানো অসমসাহসিক কাজ করে বসবে সে?

পথে বেরোবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত কি বুঝতে পেরেছিল এই কলকাতাকে সে কত ভালবাসে? বুঝতে পেরেছিল কি এর সঙ্গে তার

নাড়িতে নাড়িতে সহস্র বাঁধন ? বুঝতে পেরেছিল কি, যে কলকাতায় সৌরেশ আছে, সে কলকাতা ছেড়ে যাবার সাধ্য তার নেই ?

পথে পা ফেলবার মুহূর্তখানেক আগেও কি বুঝেছিল সুচেতা, তার সমস্ত অন্তরাত্মা বিদ্রোহ করে বলবে 'না না না'। আর তার সমস্ত হৃদয় পরম আশ্বাসের সুরে বলবে 'কেন তুমি নিজেকে নিজে এমন শাস্তি দেবে ? আজও তো সমস্ত পৃথিবী তোমার হাতের মুঠোয় !'

নাঃ কিছুই বুঝতে পারে নি সুচেতা।

ফ্ল্যাট বাড়ির সিঁড়ি। কে কার দিকে তাকায় !

সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার সময় পর্যন্ত অবস্থাটা হৃদয়ঙ্গম হয় নি। ঘরের দরজার কাছে এসেই হঠাৎ যেন সমস্ত পৃথিবী দুলে উঠল। এ কী করে বসলো সে ! এখন যে আর ছুটে পালিয়ে যাবার পথ নেই !

পথ নেই, কারণ চাকরটা হাঁ করে তাকিয়ে দেখছে। হয়তো সমস্ত নাটকটার চেহারাই অন্য রকম হয়ে যেত, যদি ওই লোকটার সপ্রশ্ন বিস্মিত দৃষ্টির সামনে এসে পড়তে না হতো সুচেতাকে। দরজার সামনে এসে দাঁড়াতেই চিরপরিচিত ঘরখানা তার সমস্ত পরিবেশ নিয়ে যেই আচমকা এমনি ধাক্কা মারতো, এমনি ধারা সমস্ত পৃথিবীটা দুলে উঠতো, হয়তো আবার উল্টোমুখো ছুটে নেমে যেতো সুচেতা।

এখন আর ফেরা চলে না।

কিন্তু ফেরাই যদি না চলে, এ ঘরে ঢুকবে কি সুচেতা কুণ্ঠিত পদক্ষেপে ?

বহিরাগত অতিথির মত ভৃত্যটাকে প্রশ্ন করবে কোথায় একটু বসা চলে ?

পাগল !

দৃপ্ত পদক্ষেপে ঘরের মধ্যে এসে ঢোকে সুচেতা, সমস্ত কুণ্ঠা সবলে ত্যাগ করে।

এখন শুধু কথার আবরণে লজ্জা রক্ষা!

তাই কথায় কথায় ঠাসবুনুনি!

"কীরে বাবা অমন চমকালি যে? ভূত দেখলি নাকি? ভূত নয় ভূত নয়, ভগবান—বুঝলি? এবার নৈবিদ্যি সাজা। বলি ঘর দোর কি করে রেখেছিস? সারাদিন করিস কি? শুধু খাস আর ঘুমোস?"

হাঁ করে তাকিয়ে থাকে রাধাচরণ, তার কর্মজীবনে এহেন অভিনব ঘটনা কখনো ঘটে নি।

মহিলাটি যে বাবুর কোন নিকট আত্মীয়া তাতে আর সন্দেহ নেই। মনে হচ্ছে বোনটোন। কিন্তু এতদিনের মধ্যে তো কই আসে নি? মনে হচ্ছে বিদেশে ছিল।

'মনে হচ্ছে'র সুতো টেনে টেনে অনেক কিছু মনে করে নেয় রাধাচরণ।

কিন্তু সুচেতার কি হলো?

একটা দুঃসহ দুঃস্বপ্নের অন্ধকার থেকে হঠাৎ কি জেগে উঠল সুচেতা? একবার শুধু বিহ্বলদৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখা—জাগরণটা সত্যি, না স্বপ্নটা সত্যি? তারপর চোখ রগড়ে দেখে নিয়ে সত্যিকার ঘুমভেঙে ওঠে।

কিছুতেই কি এখন মনে করতে পারছে, অনন্তকাল সুচেতা এ ঘরের বাইরে পড়েছিল? না, কিছুতেই মনে করতে পারছে না। সীমাহীন দিন আর অন্তহীন রাত্রি দিয়ে গড়া নীরেট ভারী একটা সময়ের পাহাড় যেন ধূসর শূন্যতায় মিলিয়ে গেল।

এই তো সেই দুদিকের দেয়াল ঘেঁসে দুখানা খাট, ওই তো খাটের মাথার কাছের কোণে কোণে ছোট্ট কাশ্মীরী টেবিল দুটো, ওই তো বইয়ের র‍্যাকের ওপর সুচেতার নিজের হাতে কেনা টেবল-ল্যাম্পটা, আর ওই তো তার পাশে হেলান দিয়ে রাখা সুচেতার শিল্পকর্মের নমুনা চিত্রকরা সরাখানা। ওর গায়ে অঙ্কিত সাঁওতালী যুবক

যুবতীর প্রণয় রসাভাসের ভঙ্গিমাটুকু তো এখনো অবিকল তেমনি। যা নিয়ে সুচেতা আর সৌরেশের মধ্যে কত মধুর আলোচনা, কত কপট কলহ! যেখানে যা ছিল ঠিক তেমনিই আছে।

শুধু পুরু একটা ধুলোর স্তর আচ্ছন্ন করে রেখেছে তাদের। সুচেতা একবার ফুঁ দিলেই মুহূর্তে উড়ে যেতে পারে এই ধুলোর স্তর!

আর ওই পর্দাগুলো!

রোদে জলে রং রেখা সমস্ত কিছু হারিয়ে ফালি ফালি হয়ে ছিঁড়ে জড়ো হয়ে আজও যেগুলো ঝুলে রয়েছে জানালার গায়ে। ওগুলোও এই মুহূর্তে টান মেরে ফেলে দিয়ে আবার সোনারঙা আলোয় ঘর মুড়ে দিতে পারে সুচেতা ইচ্ছে করলেই।

কি যে হলো! কোথা থেকে এলো জোয়ার, নদী উঠলো ফুলে! এলো বাঁধভাঙা কথার বন্যাস্রোত! সে বন্যা এসে বেচারা রাধাচরণটাকেই আক্রমণ করে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়।

"যাই বলিস বাপু, ঘর করে রেখেছিস বটে একখানা! দেখে চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছে! নে নে, শীগগির বিছানার এই চাদর ওয়াড়গুলো টান মেরে ধোপার বাক্সয় ফেলে আয়। এক মিনিটও ওগুলো চোখে সইতে পারছি নে, বুঝলি? কী করে থাকিস রে তোরা? যেমন মনিব তেমনি চাকর জুটেছে বটে! আলমারির চাবিটাবি বোধ হয় তোর কাছেই? কি বললি, চাবিই নেই? সব বাক্স আলমারি খোলা! গুড্! দিনে কত করে 'উপরি' রোজগার করিস বাপ! ওঃ তোর নামটাই যে এখনো জানা হয় নি। বল বাপ, কি নাম তোর? শুনে কানে মধুবর্ষণ হোক! ভ্যাবলার মত দাঁড়িয়ে রইলি যে? নাম বল?"

মাথাটা চুলকে মাথার সব চুলগুলো খাড়া হয়ে উঠেছে, তবু আর একবার চুলকে নিয়ে রাধাচরণ সবিনয়ে নিজের নামটি উচ্চারণ করে।

আর সঙ্গে সঙ্গে সুচেতা খিলখিল করে হেসে ওঠে। প্রায় অস্বাভাবিক উচ্চহাসি। "কি বললি? রাধাচরণ! ওঃ তাই:

তাই এমন রাঙের রাধার মত দাঁড়িয়ে আছিস! মানুষের মত মানুষ তো একটা ছিল, সেটাকে উচ্ছেদ করে তোকে প্রতিষ্ঠিত করলো কবে? যাও বাবা রাধাচরণ, ঘর ঝাড়বার যন্ত্রপাতিগুলো নিয়ে এসো। কড়ি বরগা থেকে শুরু করে হাত লাগাও। আর ওই জানলার পর্দাগুলো টেনে ছিঁড়ে ফেল দিকি! আর আব্রুতে দরকার নেই।"

এবারে রাধাচরণ একটা কথা বলে, "আরও পর্দা আছে আলমারীর মধ্যে কাগচে মোড়া।"

'মনে হচ্ছে'র সূত্র ধরে যত যা কিছুই মনে হোক তার, কিন্তু কে জানে কোন সূত্র ধরে সে সাব্যস্ত করে ফেলেছে এঁকে কর্ত্রীর সম্মানটা দিতেই হবে! তাই মুখে বেশী কথা না জোগালেও ঘর তচ্‌নচ্‌ করে ঝাড়ামোছা শুরু করে দেয় সে।

সুচেতা আলমারীর সামনে গিয়ে একবার চুপ করে দাঁড়ায়। একপাল্লা আলমারী, পুরো পাল্লাটাই আশী। আর্শীতে ছায়া পড়েছে। কার ওই ছায়া? এইমাত্র যে অপরিচিতা এঘরে পা ফেললো? না এ ছায়া অনেক অনেকদিন আগে থেকে এখানেই স্থির হয়ে আছে?

আলমারীর হ্যাণ্ডেলটায় হাত লাগাতেই পাল্লাখানা শিথিল হয়ে খুলে এলো। অর্থাৎ ঠেকানো ছিল মাত্র।

ভিতরে কি আছে চটকরে বোঝা শক্ত। এলোমেলো অগোছালো রাশিকৃত জামা কাপড়ের স্তূপ, যেন মুঠো মুঠো করে ঠেলে রাখা হয়েছে!

তবু প্রার্থিত বস্তুটা পাওয়া গেল। কালো বর্ডার-টানা হলুদরঙা সেই পর্দা কখানা! সেইগুলো কোলের কাছে নিয়ে একটা খাটের উপর বসে পড়লো সুচেতা। যে খাটখানা একদা সুচেতার বলে চিহ্নিত ছিল। হঠাৎ যেন ভারি ক্লান্তি লাগছে। বসে থাকে, সময়ের জ্ঞান ভুলে। কথা ভাল, নিস্তব্ধতাকে বড় ভয়, এক সময় রাধাচরণ ভয়ে ভয়ে বলে, "এঘরে বেজায় ধূলো উড়ছে পিসিমা, বসবার ঘরে যেয়ে বসলে হতো না?"

পিসিমা!

সুচেতা চমকে সোজা হয়ে বসে। তারপরই প্রায় ধমক দিয়ে ওঠে, "পিসিমা আবার কি? হঠাৎ পিসিমা বলবার নির্দেশ কে দিল তোমায়?"

"আজ্ঞে কি বলবো তাহলে?"

"কিছু বলবে না! বলবার দরকারটা কি পড়েছে?" আবার যেন সুচেতা গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে, "বলাবলি রেখে কাজ করো দিকি! বলি জলের কুঁজোটায় কতদিন আগে জল ভরেছিস?"

রাধাচরণের মাথায় ব্যথা ধরে যায় চুলকে চুলকে। তবু বিরাম নেই। "আজ্ঞে এই দু'তিন দিন।"

"মাত্র দু'তিন দিন? পাগল! ভাল করে ভেবে দেখ দিকি, মাসখানেক কি না! গায়ে যে মাকড়সায় জাল বানিয়েছে রে! তোর বাবুর বোধ হয় বাড়িতে জলটল খাওয়ার দরকার হয় না?"

"আজ্ঞে সে কি!" রাধাচরণ এতক্ষণে আত্মপক্ষ সমর্থনের একটা পথ পায়। "জল খাবে না কি! সারারাত ধরে তো খালি গেলাস গেলাস জলই খায় বাবু! অনিদ্রে রোগ আছে কি না।"

"অনিদ্রে রোগ আছে!" সুচেতা একটু থেমে বলে, "তা ভালো! তা বাড়ি ফেরে কখন তোর বাবু? রাত বারোটা, না একটা?"

রাধাচরণ এবার হেসে ওঠে, "কি বলছেন আজ্ঞে? বাবু কি কুলি মজুর লোক যে ওপরটাইম খেটে রাত বারোটায় বাড়ি ফিরবে? আপনি কি জানো না বাবু ব্যালিষ্টার?"

আবার হাসি পেয়ে যায় সুচেতার। হেসে হেসে বলে, "হুঁ, একটু একটু যেন জানি মনে হচ্ছে।"

"তবে?" রাধাচরণ বিজয়গর্বের হাসি হাসে, "হাইকোর্ট যতক্ষণ খোলা, ততক্ষণ বাবুর কাজ! তারপর আবার কি করবে? বাস নয়, ট্রাম নয়, নিজের মটোরগাড়ি চড়ে চলে আসবে, দেরীটা কিসের হবে? এই তো আপনি একটু বসলেই দেখা হবে।"

একটু বসলেই! দেখা হয়ে যাবে!

আর একবার যেন ধাক্কা খেয়ে চমকে ওঠে সুচেতা। কিন্তু সে ধাক্কায় শুধুই কি চমকে ওঠে? গড়িয়ে তলিয়ে যায় না একটা আতঙ্কের গভীর গহ্বরে?

এ কী!

এ কী কাণ্ডজ্ঞানহীনের মত কাজ করে বসেছে সে! কেন সে এখানে এসেছে?

তার না হাওড়া স্টেশনে গিয়ে চারটের ট্রেন ধরবার কথা! তার বাড়িতে না যাত্রার আয়োজন সমস্ত প্রস্তুত! ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলো। দেখলো পৌনে ছটা।

কে তাকে নিয়ে এল এখানে?

নিজে নিজে কখনো সুচেতা এখানে আসতে পারে? না না, এ কোনো অশরীরি আত্মার কারসাজি! সুচেতাকে বিভ্রান্ত করে উড়িয়ে এনে এখানে ফেলেছে!

সুচেতা চাকরী করতে যাচ্ছে, সুচেতা কলকাতা ছেড়ে চলে যাচ্ছে, তা নয় সুচেতা ভূতুড়ে হাওয়ায় উড়ে এসে এই ভয়ঙ্কর জায়গায় এসে বসে আছে?

বাইরের আকাশ এখনো রোদে ভাসছে, ঘরের মধ্যে দেয়ালের ছায়ায় ছায়ায় বেলা পড়ে আসার আভাস!

কোথায় যেন যাচ্ছিল সুচেতা?

নামটা কিছুতেই মনে আসছে না। কিছুতেই মনে আসছে না তার যাত্রাসঙ্গীর নামটা। শুধু দামোদর গুঁইয়ের চেহারাটা একবার মনের চোখের সামনে ভেসে উঠল।

"পর্দাগুলো টানিয়ে দিই দিদিমনি?"

ভেবে চিন্তে আর একটা সম্বোধন আবিষ্কার করেছে রাধাচরণ।

সুচেতা কাগজের প্যাকেটটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে নির্জীবের মত বলে, "টাঙাও। কিন্তু তার আগে আমাকে একটা ট্যাক্সী এনে দিতে পারো? খুব তাড়াতাড়ি।"

"ট্যাক্সী!"

রাধাচরণ 'হাঁ'।

"হ্যাঁ হ্যাঁ খুব শীগগির! আচ্ছা থাক্ আমিই—" কথার সঙ্গে উঠে দাঁড়ায় সুচেতা।

রাধাচরণ হাঁ মুখ বুজে বলে ফেলে, "বাবুর সঙ্গে দেখা না করেই—"

"সে আর একদিন হবে রে! আজ আমার বড় তাড়া আছে। একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম! সর সর।"

কিন্তু পালাবার আগেই বসে পড়তে হয়েছে সুচেতাকে। একটি অতি পরিচিত জুতোর শব্দ ধ্বনিত হয়েছে তখন একেবারে দরজার গোড়ায়।

আর এখন কী করবার আছে সুচেতার!

ওই জুতোর শব্দটা ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়বার আগেই খিল লাগিয়ে দেবে দরজায়? হয়তো তেমন অসম্ভব কাণ্ডও সম্ভব হয়ে পড়তো, যদি না চাকরটা দাঁড়িয়ে থাকতো ঘরের মাঝখানে। আর যদি না সে বলে উঠতো, "এই তো বাবু এসেই গেছে!"

দরজার সামনে সৌরেশ এসে দাঁড়ালো। দাঁড়ালো নয়, দাঁড়িয়ে পড়লো।

কিন্তু সে কী চীৎকার করে উঠলো "কে তুমি, তুমি কে" বলে? সে কী তীব্র ব্যঙ্গে হেসে উঠলো? সে কি এই অদ্ভুত নির্লজ্জতা দেখে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে পিঠ ফিরিয়ে চলে গেল? না কি সে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েই রইল?

না, এসবের কিছুই করলো না সে।

শুধু তার ক্লিষ্টক্লান্ত কালিমাড়া মুখের ওপর যেন একটুকরো জ্যোৎস্নার আলো ফুটে উঠলো!

শুধু তার চশমার নীচে অবস্থিত চোখ ছুটোর অন্তরালবর্তী সূক্ষ্ম স্নায়ুগুলো যেন এক মুহূর্ত তপ্ত হয়ে উঠেই গলে যেতে চাইলো!

তারপর নিতান্ত সহজ ভঙ্গীতেই ঘরের মধ্যে এসে পড়লো সে। আর এসে অভাবনীয় আকস্মিকের দিকে না তাকিয়ে চাকরটাকেই বলে উঠলো, "কি রে খুব বকুনি খেয়েছিস তো ? আর খুব খেটেছিস ? নে এখন খুব ভালো করে দু' পেয়ালা চা বানিয়ে আন দিকি !"

রাধাচরণের আর বাক্যস্ফূর্তি হয় না।

সে শুধু সন্দেহবিহ্বল দৃষ্টিতে একবার বাবুর আর একবার ওই রহস্যময়ী নবাগতার দিকে তাকিয়ে দেখে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। এখন আর সে 'মনে হচ্ছে'র বঁড়শি ফেলে অথই জল থেকে মাছ তুলতে চেষ্টা করে না। ব্যাপারটা যেন তার মনে হওয়ার বাইরে চলে যাচ্ছে। এ আবার কেমন রে বাবা ! কে ওই মেয়েটা ? কী সম্পর্ক দুজনার ? কিন্তু যাই হোক, অনেককাল পরে দেখা তো বটে ! কিন্তু এটা কেমন হলো ! ওকে দেখে আহ্লাদ প্রকাশ করা তো দূরের কথা, ভাল করে একবার তাকিয়েও দেখল না বাবু ! ইদিকে অথচ আবার সঙ্গে সঙ্গে চায়ের ফরমাস ! মানুস মানুষকে দেখে কুশলবার্তা চাইবে, দুটো গল্পসল্প করবে, তবে তো খাওয়া দাওয়া !

আর উনিই বা কেমন মেয়েছেলে ! এসে মাত্তর তো ঝড় বইয়ে দিলেন, এখন আবার ধরাপড়া চোরের মতন ভাবভঙ্গী ! মনে হচ্ছে ভেতরে রহস্য আছে ! এ বাবা বোনটোন নয় !

সৌরেশ ওর এই ভাবান্তর লক্ষ্যও করলো না।

করবার কথাও নয়। শিশুকে, বৃদ্ধকে, আর চাষাভুষো লোককে অবোধ ভাবাই বুদ্ধিমান মানুষের রীতি। তাই আবার কি ভেবে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে পকেট থেকে একখানা দশটাকার নোট বার করে বললো, "আর এই শোন শোন। চায়ের আগে ভাল কিছু খাবার নিয়ে আয় দিকি।"

খাবার !

বাজার থেকে খাবার আনিয়ে খেতে বাবুকে কোনদিন দেখে নি রাধাচরণ, তাই অবাক দৃষ্টিতে বলে, "কি খাবার ?"

"কি খাবার! তাইতো!" ব্যস্ত সুর ধ্বনিত হয়ে ওঠে, "যা হোক! মানে যা তোর খুশি! সন্দেশ সিঙাড়া চপ ফ্রাই—"

রাধাচরণ মনে মনে বলে, "বুঝেছি বাবা! আমাকে সরানোর কৌশল! কিন্তু সেও রীতি অনুসারে মুখে অবোধের ভান বজায় রেখে বলে, "সব টাকার?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ সব টাকার!"

"সব উঠবে বাবু?" বাবুর মাথার অবস্থাটা ঠিক আছে তো!

"কী মুস্কিল! উঠবে না কি রে? ভীষণ খিদে পেয়েছে যে আমার! আর তারপরে তো তুই-ই আছিস।" হেসে ওঠে সৌরেশ।

কি ভাবে নোটটা থেকে অন্ততঃ গোটা আড়াই তিন টাকা সরানো যায়, বোধ করি তাই ভাবতে ভাবতেই রাধাচরণ পথে পা বাড়ায়।

নাঃ সুচেতার মেজাজ আর বদলালো না কোনদিন। বদলাবেও না বোধ হয়। নইলে এই ভয়ঙ্কর অপ্রস্তুত মুহূর্তে কিনা দাঁড়িয়ে উঠে সেই স্বভাবসিদ্ধ তীক্ষ্ণ স্বরে বলে ওঠে, "স্বীকার করতেই হবে অতিথি সৎকারে তোমার জুড়ি নেই।"

"অতিথি সৎকার!"

এতক্ষণে সৌরেশ একটা আসন গ্রহণ করে শান্ত স্বরে বলে, "না সুচেতা, ওই ব্যাটাকে অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যে বহিষ্কার করবার একটা উপায় আবিষ্কার করলাম মাত্র! কিন্তু এমন একটা অদ্ভুত অসম্ভব কাণ্ড ঘটলো কি করে বলতো? কিছুতেই যেন বিশ্বাস করতে পারছি না, মনে হচ্ছে স্বপ্ন!"

"তাই মনে করাই ভালো! আমি উঠি।"

খাটের ধারটা ধরে দাঁড়িয়ে আছে সুচেতা। ঘরটা অন্ধকার হয়ে গেছে, স্পষ্ট করে মুখ দেখা যাচ্ছে না ওর।

সেই আবছা মুখের দিকে তাকিয়ে সৌরেশ বলে ওঠে, "দোহাই তোমার সুচেতা! এটুকু অন্ততঃ ভাবো নিষ্ঠুরতারও একটা সীমা থাকে।"

সুচেতা বুঝি হেসেই ওঠে।

হ্যাঁ হেসেই ওঠে। হেসে উঠে বলে, "ভুল বললে। বরং সব কিছুরই সীমা থাকে, থাকে না শুধু নিষ্ঠুরতার।"

"না! ওকথা আমি মানি না।" সৌরেশ উঠে দাঁড়িয়ে কাছে সরে এসে বলে, "আমি বিশ্বাস করি পৃথিবীতে মমতা আছে, করুণা আছে, দয়া আছে। নইলে তুমি কেন হাওড়া স্টেশনে যাবার জন্যে বেরিয়ে যাত্রাবদল করে এখানে চলে এলে ঈশ্বরের আশীর্বাদের মতো।"

সুচেতা কি ভুলে গিয়েছিল সব কিছু? ভুলে গিয়েছিল অতীত ভবিষ্যৎ? তাই হাওড়া স্টেশনের নামে অমন চমকে উঠলো?

চমকে উঠে বললো, "হাওড়া স্টেশন? কে বললে আমি স্টেশনের জন্যে বেরিয়ে ছিলাম? জিনিসপত্র তো সবই বাড়িতে গোছান পড়ে আছে।"

সৌরেশ সহসা ওর একটা হাত চেপে ধরে বলে, "তবে বল কেন এই দয়া?"

"দয়া! দয়া আবার কি?" সুচেতা হেসে ওঠে, "চলে এলাম এমনি! ভাবলাম যাচ্ছিই যখন কলকাতা ছেড়ে, চেনা জানা লোকেদের সঙ্গে একবার দেখা করে যাওয়া ভালো!"

"কিন্তু তোমার ট্রেন তো ছিল চারটের সময়!"

"কে বললে?" সুচেতা বেপরোয়া ভঙ্গীতে মিথ্যাই বলে, "সাতটার সময় তো।"

"সাতটার সময়!" সৌরেশ অবিশ্বাসের সুরে বলে, "এনকোয়ারি অফিস যে বললো, শক্তিগড়ে যাবার আর কোন গাড়ি আজ নেই!"

"তুমি স্টেশনে গিয়েছিলে?" আস্তে যেন নিজেকে শোনানোর সুরে উচ্চারণ করে সুচেতা।

"হ্যাঁ সুচেতা," সৌরেশ আবেগভরে বলে, "কিন্তু ভাগ্যিস ট্রেন ছেড়ে চলে যাবার পর নিজেও কোথাও চলে গেলাম না! ভাগ্যিস

ফিরে এলাম ! ভারি টায়ার্ড বোধ করছিলাম। পশু সারারাত শ্মশানে কেটেছে, কাল সারারাত বিছানায় শ্মশান জাগিয়ে কাটিয়েছি।”

“তাই নাকি ?” সুচেতা এখনও আবার হাসছে, “কাল আবার কার মৃত্যু হলো ?”

“মৃত্যু ! তাই যদি বলো সুচেতা, তো বলবো মৃত্যু হলো আমার ভুলের, আমার বোকামির। আমি কেন স্টেশনে গিয়েছিলাম জানো ? তোমাকে আটকাতে। বিফল হলে অনুসরণ করতে।”

“অনুসরণ !”

“হ্যাঁ সুচেতা ! তুমি জলে ঝাঁপিয়ে পড়বে আর আমি তীরে দাঁড়িয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলবো, এমন অদ্ভুত অবস্থা করে তোলার বোকামিটা বেজায় হাস্যকর মনে হলো।”

পুরোপুরি অন্ধকার হয়ে গেছে ঘরটা, তবু বুঝি খেয়াল নেই ওদের।

না কি ওদের অবচেতন মন আশঙ্কিত হয়ে ভাবছে—যা আছে তাই থাক ! অনন্তকাল ধরে থাকুক এই গভীর গাঢ় অন্ধকারের পটভূমিকা ! একটু নড়ে উঠলেই ভেঙে যাবে এই মধুর স্বপ্ন, মুছে যাবে এই অলৌকিক ছবি, থেমে যাবে এই অনাস্বাদিত সুর !

আর সুচেতা যে প্রাণপণে যুঝতে চায় ! অন্ধকারটাই তবু তার দুর্গ, তার বর্ম !

যুঝতে চায় বলেই অস্ত্রক্ষেপের চেষ্টা ! “ওসব বড় বড় কথা যাক, বোঝা যাচ্ছে এখনও তুমি আমার গতিবিধির ওপর নজর রাখতে চাও। কিন্তু জানো এর চাইতে বোকামি আর কিছু নেই। যেখানে অধিকার ফুরিয়েছে, সেখানে আবার জবরদস্তী করে অধিকার স্থাপনের চেষ্টা বোকামি ছাড়া আর কি ?”

“আশ্চর্য কি জানো সুচেতা ?” এবার সৌরেশও বোধ হয় হাসে ক্ষুব্ধ একটু হাসি, “অধিকার ফুরিয়েছে এই কথাটা ঠুকে ঠুকেও মগজে ঢোকাতে পারি না। সে চেষ্টা করতে গেলেই মগজটা আমার ছেলেমানুষী

দেখে হেসে ওঠে। তুমি হঠাৎ অজানা অচেনা কোথায় যেন চলে যাবে, আমি কলকাতায় বসে থাকবো, এমনটা হওয়া সম্ভব—সেটাই কিছুতে বিশ্বাস করতে পারলাম না। মনে পড়ে সুচেতা, সেই আমরা যখন পিকনিক করতে যেতাম? তুমি আমার নিষেধ বারণ না মেনে যেখানে ইচ্ছে নেমে পড়তে, আর আমাকে লাফিয়ে পড়তে হতো হয়তো চলন্ত গাড়ি থেকেই? মনে আছে, তুমি আমাকে দেখতে না পাওয়ার ভান করে চট্‌পট এগিয়ে যেতে, আর আমি পিছন থেকে ছুটে ছুটে গিয়ে তোমাকে ধরে ফেলতাম?"

উত্তর এল না সুচেতার দিকে থেকে।

কিন্তু সৌরেশের বুঝি এখন আর উত্তরেরও প্রয়োজন নেই। কথার জোয়ার এসেছে ওর। তাই আবারও বলে, "ভাবলাম তেমনি করে তোমার সঙ্গ নেব, আর তেমনি করে তোমার গন্তব্যস্থানে নেমে পড়ে শুধু পাশাপাশি এগিয়ে যাবো।"

এবার সুচেতার কণ্ঠ থেকে স্বর ফোটে।

কিন্তু সত্যিই কি সুচেতার কণ্ঠ? না কোন যান্ত্রিক শব্দ? শুকনো খটখটে অস্বাভাবিক সেই স্বরটা একটা যান্ত্রিক হাসির সঙ্গে বলে ওঠে, "মনে হচ্ছে—এই ভরা দিনের বেলাতেই মাত্রা চড়িয়ে এসেছো!"

"মাত্রা!"

"হ্যাঁ! হ্যাঁ! তোমার সেই আদি অকৃত্রিম নেশার মাত্রাটি!"

যাক্ অনেক কষ্টে আত্মসম্মান বজায় রেখেছে সুচেতা। হোক সে পরম নিষ্ঠুরতার আবরণ, তবু তো ঢাকা গেল নিজেকে!

কিন্তু সৌরেশ কি সে ঢাকা রাখতে দেবে?

দেবে যদি তো অমন করে হেসে উঠছে কেন? "কী আশ্চর্য! এখনো তুমি সেই তামাদি কথাটা মনে রেখেছ? ওসব ছেলেমানুষী কবে ছেড়ে দিয়েছি।"

"ছেড়ে দিয়েছ! ছেড়ে দিয়েছ!" সুচেতা হঠাৎ ফের বিছানায় বসে পড়ে রুদ্ধস্বরে বলে, "মদ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছ তুমি?"

"দিয়েছি তো এতে আর আশ্চর্যের কি আছে? ইচ্ছে করলেই ছাড়া যায়।"

নাঃ আত্মসম্মান বজায় রাখা আর সম্ভব হলো না।

ঝর ঝর করে ঝরে পড়লো একটা জলোচ্ছ্বাস। "ইচ্ছে করলেই পারা যায়! শুধু সে ইচ্ছেটা তখন হয় নি!"

সৌরেশ আবার হাসে। ক্লান্ত করুণ শ্রান্ত গম্ভীর হাসি।

"হয়েছিল সুচেতা, বহুবার ইচ্ছে হয়েছিল, শুধু ভেবেছিলাম তোমার ভালবাসাকে কিছুতেই ফেল হতে দেব না। পরীক্ষায় পাশ করাবোই করাবো! ভুলই হয়েছিল, তাই না?"

"হ্যাঁ ভুলই হয়েছিল।" সুচেতা মাথা নীচু করে বলে, "তোমার মত অত বড় আমি নই। কিন্তু এবার আমি উঠি, আলোটা জ্বালো।"

সৌরেশ আলো জ্বালার লক্ষণ দেখায় না। বরং সুচেতার একান্ত নিকটে বিছানাটার উপরেই বসে পড়ে বলে, "যদি উঠতে না দিই? যদি যেতে না দিই?"

"না না! আলো জ্বালো, যাই আমি।"

"ভয় পাচ্ছ?" আন্দাজে সুচেতার দুখানা হাতই মুঠোয় চেপে ধরে সৌরেশ।

"ভয় কিসের?" সুচেতা ফিকে হাসি হাসে, "তুমি তো আর সত্যি বল নি?"

"সত্যিই বলছি সুচেতা! আমি সত্যই বলছি। এমন গভীর সত্য বোধ হয় জীবনে কখনো বলি নি। শুধু তোমারই সাহস হচ্ছে না সে সত্যকে 'সত্যি' বলে গ্রহণ করতে।"

"যা অসম্ভব তা—"

"না না সুচেতা, অসম্ভব নয়। আমি বলছি অসম্ভব নয়।" সৌরেশ ব্যাকুলভাবে বলে, "হয়তো আমি লোভী, হয়তো আমি নির্বোধ, তবু বল কোথাও কোন ভুল কি ধরা পড়ছে? কোথাও ঘটছে ছন্দপতন? এসে দেখলাম তোমার হাতের ক্ষণিক স্পর্শ পেয়ে

ঘরের রূপ কী ভাবে বদলে গেছে! মনে হচ্ছে লক্ষ্মীর ছোঁওয়া পেয়ে হেসে উঠেছে! ঘর তো ঘরের মালিকেরই জীবনের প্রতীক! এই ঘরের মত এই জীবনও কি আবার লক্ষ্মীর স্পর্শ পেয়ে হেসে উঠতে পারে না?"

"কী বলছো তুমি?" সুচেতা ধরাধরা গলায় বলে, "হঠাৎ একবার এসে পড়েছি বলেই কি—"

সৌরেশ গভীরস্বরে বলে, "এসেছ হয়তো একদিন, কিন্তু এই একদিনের পিছনে কি অনেক দিনের ইচ্ছের প্রেরণা ছিল না সুচেতা? ছিল, শুধু তুমি সেটা কিছুতেই স্বীকার করতে চাইছো না। সেদিন মেজবৌদি বললেন, "আইন আমাদের ছাড়পত্র দিয়েছে বটে, কিন্তু অলক্ষিত জগতে আর একটি যে বিচারশালা রয়েছে—"

"মেজবৌদি?" শিথিল স্বরে বলে সুচেতা প্রায় স্বগতোক্তির মতো

"হ্যাঁ মেজবৌদি। কিছুদিন থেকে কী যে ক্ষ্যাপামিতে পেয়েছিল সুচেতা, রোজ যেতে শুরু করেছিলাম তোমাদের ওখানে। ভেবেছিলাম তোমায় শুধু একটি প্রশ্ন করবো। কিন্তু আশ্চর্য! এতক্ষণ এত কাছে পেলাম তোমায়, কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারছি না, কী তোমাকে বলতে চেয়েছিলাম।"

সুচেতা মুখ তুলে আস্তে আস্তে বলে, "আমিই কি বুঝতে পারছি কেন হঠাৎ এলাম? সত্যিই কি তোমার ঘর গুছিয়ে দিতে?"

"তাই, তাই সুচেতা, সত্যিই তাই! সত্যিই আমার দীর্ঘদিনের অগোছালো ঘর গুছিয়ে দিতে!"

"পাগল! শোনো, ওঠো, আলোটা জ্বালো।"

"আলো জ্বালবার ভার তো তোমারই সুচেতা!" সৌরেশ ওর দুই বাহুমূল চেপে ধরে গাঢ় স্বরে বলে "সুচেতা! এসো না, আবার আমরা ফের নতুন করে প্রেমে পড়ি নতুন করে জীবন শুরু করি।"

কাটল কয়েকটি মন্থর মুহূর্ত।

সুচেতা কষ্টে বলে, "আমরা কি পাগল!"

"পাগল আমরা নই সুচেতা! পাগল তারাই যারা শুধু সামান্য একটু চক্ষুলজ্জার জন্যে সমস্ত জীবনটাই বরবাদ দেয়। সে পাগলামি কেন করবো আমরা? আমরা কি সত্যিই চিরকাল তুজনে তুজনকে ছেড়ে থাকতে পারবো?"

সুচেতা চমকে মুখ তুলে তাকালো, তারপর আস্তে আস্তে বললো, "আমাদের জীবনের সমস্ত ঘটনার কুশ্রীতা ক্ষমা করবার শক্তি তোমার হয়তো আছে, আমার নেই। অতো ক্ষমা বহন করবার শক্তিও আমার নেই।"

"নাই বা থাকলো!" সৌরেশ গাঢ় স্বরে বলে, "সেটাও তোমার হয়ে আমিই বয়ে দেব। তোমায় আমি আর ফিরে যেতে দেব না সু!"

"নিজের কোর্টে পেয়ে ভয় দেখাচ্ছ আমায়"—সুচেতা তাড়াতাড়ি উঠে ঘরের আলোটা জ্বালিয়ে দেয়, তারপর কেমন একটা হতাশ সুরে বলে, "আমাকে আটকে রাখবে সে জোর কি তোমার আর আছে?"

"খুব আছে। এই তো! দেখ তো আটকানোটা কে আটকাতে পারে?"

অন্ধকারে হাতের কাছাকাছি হাত রেখে সাহস হচ্ছিল না, সাহস হলো আলোর বন্যা বহা ঘরে! কিন্তু সুচেতা কেন পারছে না এই জোরের কাছে নিজেকে এলিয়ে দিতে, ছেড়ে দিতে, নিঃশেষে সঁপে দিতে? ও কেন অমন হাঁপিয়ে উঠে ছাড়িয়ে নেয় নিজেকে?

তবে বিধাতা ওরই সহায়! ছাড়িয়ে নেবার সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুট স্বরে এটুকু বলতে সুবিধে পেয়েছিল সে—"সিঁড়িতে কে আসছে!"

"হোপলেস!" সৌরেশ খাটের উপর এলিয়ে পড়ে হতাশসুরে বলে, "বেটা কি আকাশে উড়ে এল? হিসেবে গোঁজামিল দিতেও কিছু সময় হাতে রাখল না?"

সুচেতা এখন বোবা হয়ে গেছে।

রাধাচরণ সোৎসাহে ঘরে ঢোকে গোটা তুইতিন মিষ্টান্নের বাক্স আর কাগজের প্যাকেট নিয়ে। খুব সুবিধে করা গেছে। দশ আনা

করে ফ্রাই, বারো আনার হিসেবে হিসেব গেঁথে এনেছে সে, তাছাড়া সন্দেশ আর চপেও। জোড়া-তালির হিসেবটা ভুলে যাবার আগে মহোৎসাহে শুরু করে দেয়, "এই যে বাবু 'বাসন্তী রেস্তঁরা' থেকে ফ্রাই আর চপ গরম ভাজিয়ে আনলাম। ফ্রাই বারো আনা করে, আর—"

সহসা অপ্রত্যাশিত একটা ধমক খায় বেচারা। "বকবক করিস নে মেলা। এখুনি তোর গরম ভাজিয়ে আনা হলো ?"

রাধাচরণ নিভন্ত মুখে সাভিমানে বলে, "এনেছি কি না দেখুন হাত দিয়ে।"

"আচ্ছা বেশ করেছ, খাসা করেছ। এখন চা বানাওগে।"

ও চলে যেতেই সুচেতা চঞ্চল ভাবে উঠে দাঁড়িয়ে ব্যাকুল মিনতির সুরে বলে, "আমি যাই !"

একটুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে যায় সৌরেশ। তারপর সহজ শান্ত সুরে বলে "না গেলেই নয়, তাই না ?"

"বাঃ ! হঠাৎ যদি আজ না ফিরি, কাল কেউ আমার মুখ দেখবে ?"

"কালও ফিরবে না।"

"চমৎকার !" প্রায় হেসেই ফেলে সুচেতা, "কিন্তু কালকের পরও তো পশু' আছে।"

"পশু'ও ফিরবেনা। পশু' তস্থ' কোন দিনই না।"

"যা হয় না সে কথা বারবার বলে লাভ কি বলো ?"

"কেন হবে না সু ? তুমি তো চলেই যাচ্ছিলে, বাড়ি ছেড়ে দেশ ছেড়ে—"

"সে কথা আলাদা ! চলে যে যাই নি, সেও তো সবাই জেনেছে। লোকে কি বলবে বল তো ? ওঠ লক্ষ্মীটি, হাত মুখ ধুয়ে এসো, আমি তোমায় খাইয়ে যাই।"

"খাইয়ে তুমি চলে যাবে ভাবলে, সে খাদ্য গলা দিয়ে নামবে না সুচেতা !"

সুচেতা সহসা মাটিতেই বসে পড়ে অসহায়ভাবে বলে, "তবে আমি কি করবো বলে দাও।"

সৌরেশ কাছে এসে ওকে উঠিয়ে একটা সোফার উপর বসিয়ে দিয়ে গভীর স্নেহের সুরে বলে, "তোমায় কিচ্ছু করতে হবে না সু, তুমি শুধু বসে থাকো, যা করবার আমিই করবো।"

চারটের ট্রেনে বাইরে যাবার কথা সুচেতার, তিনটের আগে থেকে কোথায় বেরিয়ে গেছে, বেডিং, সুটকেশ, বেতের ঝাঁপি, এটাচিকেস ছড়িয়ে ফেলে রেখে। অস্থির হয়ে ঘরবার করছিলেন মেজবৌদি। ক্রমশঃ সে অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়লো সারা বাড়িতে।

ছোড়দা বাড়ি ফেরে নি, রাত দশটার আগে ফেরেও না কোনদিন। কিন্তু এঁরা তো আছেন! তাজ্জব বনে গেছেন এঁরা! কী ব্যাপার কি! কাউকে কিছু বলে যায় নি? না, কেউ জানে না কখন গেছে, কোথায় গেছে।

শুধু অনিতা আর সুমিতা শুকনো মুখে মুখ চাওয়াচায়ি করেছে টেবিলের ওপর ক্যামেরাটা দেখে। কিন্তু কাউকে কিছু বলে নি। ভাবছে ওটা আর এমন কি!

সেজবৌদি অবশ্য মুচকে হেসে বলেছেন, "ভাববার কিছুই নেই। যেখানে যাবার ঠিকই গেছেন। তবে অনেক ছলনা অনেক ঢং করলেন এই আর কি!"

সুচেতার সেই অজ্ঞাতকুলশীল প্রেমাস্পদকে কিছুতেই আর মন থেকে মুছে ফেলতে পারেন নি সেজবৌদি। কিন্তু ওর কথাতেও আর নিশ্চিন্ত হওয়া যাচ্ছে না, ক্রমশই অন্য একটা ভাবনা ধরছে। কলকাতা সহরে কারো বাড়ি ফিরতে দেরী দেখলে উদগ্র ক্রোধের পর যে আতঙ্কটা আসে বুক হিম হিম করে, সেই আতঙ্ক চেপে ধরছে সুচেতার দাদাদের।

রাগারাগি তো যথেষ্ট করা হচ্ছে, কিন্তু হঠাৎ কোন বিপদ হয় নি তো? হয়তো সামান্য কোন প্রয়োজনে কোথাও বেরিয়েছিল, হয়তো সেই মহামুহূর্তেই—

সন্ধ্যার অন্ধকার হয়ে যাবার পর সুচেতার ঘরে ছড়ানো যাত্রার প্রস্তুতিগুলো যেন গুঁড়ি মেরে বসে থাকা একটা অমঙ্গলের মত লাগছে।

সুচেতার বান্ধবীরা কে কোথায় থাকে? মেজবৌ চেনেন কাউকে? জানেন কারো ফোন নম্বর?

মেজবৌ, সেজবৌ, অনিতা সুমিতা কেউ জানে না? না, কেউ জানে না।

তবু তবু!

তবু দু-একজনকে ফোন করা হলো টেলিফোন ডিরেক্টরী হাঁটকে ঠিকানা দেখে। কিন্তু না, সুচেতা সেখানে যায় নি, বহুকালের মধ্যেই যায় নি।

থানায় খবর নেওয়া হবে কিনা যখন চিন্তা করা হচ্ছে, তখন অন্যখান থেকে বেজে উঠলো টেলিফোনের ঝঙ্কার!

তাড়াতাড়ি অবহিত হয়ে এগিয়ে গেলেন সেজদা "কে? কে? কে কথা বলছেন?"

কে আর, নিশ্চয়ই কোন থানার কি হাসপাতালের কোন ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী! বোঝাই তো যাচ্ছে কী ঘটেছে! যা উদ্‌ভ্রান্তের মত কাটাচ্ছে মেয়েটা কদিন! সত্যি, তাঁদের দিক থেকেও একটু 'ইয়ে' হয়ে গেছে। চিন্তা বাতাসের চাইতে দ্রুতগামী, তাই এত কথা ভাবা হয়ে যায়। ইতিমধ্যে কিন্তু ওদিক থেকে উত্তর এসে গেছে, "আমি সৌরেশ কথা বলছি।"

সৌরেশ!

প্রথমে হাতটা এলিয়ে গেল সেজদার। তারপর রিসিভারটা আছড়ে ফেলে বললেন, "চমৎকার!"

"কী হলো কি!" মেজকর্তা তাড়াতাড়ি তুলে ধরেন ভ্রাতার পরিত্যক্ত যন্ত্রটা—"কে? কী বললে? সৌরেশ! তুমি কথা বলছো সাহস আছে দেখছি! কী দরকার? কী বললে সুচেতা তোমার ওখানে রয়েছে?···ও বটে নাকি! আমাদের চিন্তাদূর করতে খবরটা দিচ্ছ? অশেষ ধন্যবাদ! কী? কী হয়েছে? একটু পরে পৌঁছে দিয়ে যাবে? না কোন দরকার নেই। এ বাড়িতে ঢোকবার তার আর দরকার নেই! দুঃসাহসেরও একটা সীমা থাকা উচিত। কী বললে পৌঁছে দেবেই? আর কাঠ গড়ায় উঠতে চাও না? কাঠ গড়া কেন ফাঁসি কাঠই হচ্ছে তোমার উপযুক্ত।"

মেজবৌদি এতক্ষণ নিরপেক্ষর ভূমিকা নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, এবার কাছে এসে দৃঢ়স্বরে বললেন, "কাকে কি বলছো তুমি?"

মেজকর্তাও রিসিভারটার উপর মেজাজের সমস্ত উত্তাপটা ফলিয়ে বলেন, "যাকে যা বলবার ঠিকই বলছি। শুধু ওই হতভাগা রাস্কেলটাকেই বা কেন, ওই বেহায়া নির্লজ্জ লক্ষীছাড়া মেয়েটাকেও ফাঁসি দেওয়া উচিত। কী এরা? মানুষ না জানোয়ার! উঃ আমরা ভেবে মরে যচ্ছি, আর ও ওই জাহান্নমে গিয়ে বসে আছে! ভাবতে পারো তুমি? কী বলে ওখানে গেল!"

মেজবৌদি প্রসন্ন হাস্যে বলেন, "ভালবাসে বলে।"

"থামো তুমি।"

"থেমেই তো আছি চিরকাল" মেজবৌদি দৃঢ় স্বরে বলে, "তবু মাঝে মাঝে কথা কইতে হয়। না কওয়া অপরাধ! অহঙ্কারটাকেই সব থেকে বড় করে তুলেছ তোমরা হৃদয়ের আর কোন বৃত্তিকেই হৃদয়ে ঠাঁই দাও না, কিন্তু নিজের না হোক অপরের মনের দিকটাও একটু দেখতে হয় বৈ কি। আমার তো পাতানো সম্পর্ক, তোমার তো সহোদর বোন, বুঝতে পারো না ওর প্রাণটা? দেখতে পাও না ওর অবস্থা?"

"এতোই যদি তো" মেজদা সিংহের মত ফুঁসতে থাকেন, "এতো কেলেঙ্কারীর দরকারটা কি ছিল? সব কিছুর গোড়া কেটে ফেলে, এখন হৃদয় বৃত্তিকে পুঁততে যাবে কোন টবের মাটিতে?"

"গোড়া কাটলেও ফুলধরে এমন গাছ আছে গো" মেজবৌদি মৃদু-হাস্যে বলেন, "তার নাম অমূলতরু। কিন্তু সে যাক, উপায় কি কিছুই নেই?"

"কিছু আছে বৈ কি! উপায় হচ্ছে তোমাকে, আর তোমার ওই আদুরে জন্তু দুটোকে পাগলা গারদে ভর্তি করে দেওয়া।"

"আর কোন উপায় নেই?" মেজবৌ একবার উপস্থিত সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে বলেন, "আর কোন উপায় নেই? একবার ভুল করে ফেললে, সে ভুল আর শোধরানো যাবে না। এই তোমাদের আইন?"

"হ্যাঁ এই আমাদের আইন।" মেজদার গর্জন আর এক পর্দা চড়ে, "আইন ছেলের হাতের মোয়া নয়।"

"কেন? ওদের ভাঙা বিয়ে আবার জোড়া লাগানো যায় না?"

মেজকর্তার আগেই সেজকর্তা ব্যঙ্গ হাস্যে বলে ওঠেন, "সে চেষ্টার আগে, তোমার ভাঙা ব্রেণ্‌টাকে জোড়া লাগাবার চেষ্টা করা দরকার মেজবৌদি। মাথাখারাপ আর কাকে বলে।"

"মাথাখারাপ কিসে? মেজবৌদি দৃঢ় প্রত্যয়ের সুরে বলেন, "যে দেশ থেকে তোমরা এই বিয়ে ভাঙবার আইন এনেছ, সে দেশে কি এমন হয় না?"

"হবে না কেন, হয়তো হয়।" তিক্ত ব্যঙ্গে বলে ওঠেন সেজকর্তা "কিন্তু এদেশটা ওদেশ নয়, এই যা।"

"নয়, বললে মানবো কেন?" মেজবৌদির স্বরে কাঠিন্য "যেটা নিতে হবে, তার ভালমন্দ সুবিধে অসুবিধে, অম্লকটু সব রসগুলো সমেতই নিতে হবে। আইন যেমন ছেলের হাতের মোয়া নয়, তেমনি মানুষও সমাজের হাতের খেলার পুতুল নয় সেজঠাকুরপো। এদেশের

মাটিতে যদি ওদেশের গাছ পুঁততেই হয়তো সে গাছের সারটাও ওদেশ থেকেই আমাদানী করতে হবে, পচা গোবর দিয়ে চলবে না।"

"হুঁ! তাহলে কি করতে হবে?"

"আবার ওদের বিয়ে দিতে হবে।"

"চমৎকার।"

"হ্যাঁ সেজ ঠাকুরপো জগতের অনেক চমৎকার ঘটনার মধ্যে এ বিয়ে একটা আশ্চর্য 'চমৎকারের' গৌরব নেবে।"

রিসিভারটা নামিয়ে রাখলো সৌরেশ মৃদু হাসি মাখা মুখে। তারযন্ত্রের মাধ্যমে যে সমস্ত বাদ প্রতিবাদ চলছিল, সুচেতা তার নীরব সাক্ষী হয়ে বসেছিল, এবার ব্যাকুল হয়ে বলে উঠলো, "মেজদা খুব চটে গেলেন তো? ছি ছি কী ছেলেমানুষী হয়ে গেল বল তো? কী বললেন ওঁরা?"

"বললেন? বললেন আমার অনুকূলেই। বললেন তোমাকে আর পৌঁছে দেবার দরকার নেই।"

এতক্ষণে সুচেতা নিজে থেকে সৌরেশের হাত ধরে। হাত ধরে শান্ত সুরে বলে, "আর আমি কিছু জানি না, এবার সব তুমি জানবে।"

"সে কথা তো আগেই বলেছি সুচেতা, এবার সব ভার আমার। তবু ওঁরা বারণ করলেও পৌঁছে তোমাকে আজ দিয়ে আসতেই হবে। না এলে অন্ততঃ তোমার সেজদা আর জামাই বাবু আমাকে 'নারীহরণ' আর সেই নারীকে বেআইনী আটকের দায়ে ফেলে আর একবার মামলা রুজু করতে পারেন। কয়েকটা দিন অপেক্ষা না করে উপায় নেই সুচেতা। আইনের দরবারে আর্জি করতে যে কটা দিন লাগে! আমাকে তো আবেদন করতে হবে," সৌরেশ গভীর গাঢ়স্বরে বলে, "আমার স্ত্রীকে আমি নতুন করে ফের বিয়ে করতে চাই।"

"এ কী হয়?" যেন অন্য ঘর থেকে ক্ষীণ স্বর ভেসে আসে সুচেতার!

"হয় সুচেতা! হতেই হবে। চেয়ে দেখ দিকি, এ ঘরটাকে কি তোমার নিজের ঘর ছাড়া আর কিছু মনে হচ্ছে? ঝড় উঠলে, এক সময় তার ধুলোয় কিছুক্ষণের জন্যে চোখটা বন্ধ হয়ে যায় সত্যি, কিন্তু ঝড়তো এক সময় থামে?"

সুচেতা এবার মুখ তুলে রুদ্ধ কণ্ঠে বলে, "কিন্তু এতো শুধু দৈবাৎ! আজ যদি আমি এমন করে এসে না পড়তাম, এ সবের কিছুই তো হতো না।"

"হতো বৈকি সু। আসতেই যে হতো তেমোয়। নেহাৎ তুমি নিজে না এসে পড়তে পারলে সত্যিই একদিন আমি গিয়ে তোমায় হরণ করে আনতাম। হয়তো আরও কিছু দেরী হতো। কিন্তু দেবতাই তো মাঝে মাঝে দৈবাতের বেশে এসে, মানুষের কাজ সহজ করে দিয়ে যান।"

— শেষ —